প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম মুদ্রণ
ডিসেম্বর
১৯৫৮

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

উপহার

লেখক-পরিচিতি

সাহিত্যজগতে 'মেরি করোলি' ছদ্মনামেই যিনি সুপরিচিতা, সে মেরি (মিনি) ম্যাকে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের সুখ্যাত গীতিকার চার্লস ম্যাকের অবৈধ সন্তান। পিয়ানো-বাজনায় অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল এঁর। সংগীত-শিল্পী রূপেই প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ছিল গোড়ায়, কিন্তু এক আকস্মিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি এসে এঁর জীবনের ধারাটিই পালটে দেয়। সংগীত-শিল্পীকে পরিণত করে সাহিত্যশিল্পীতে। এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর প্রথম উপন্যাস "এ রোমান্স অব ট্যু ওয়ার্লড্স্" রচিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

অতঃপর থেল্মা, ওয়ার্মউড, দ্য সিক্রেট পাওয়ার, দ্য সোল অব লিলিথ, বারাব্বাস, দ্য সরো'জ অব স্যাটান, দ্য মাইটি এ্যাটম, গডস্ গুড ম্যান, ভ্যাণ্ডেটা প্রভৃতি উপন্যাস পর পর প্রকাশিত হয়ে মেরি করোলিকে করে তোলে সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা। বিক্রয়াধিক্যের দিক দিয়ে "সরো'জ অব স্যাটান" রেকর্ড ভংগ করেছিল উপন্যাসের জগতে।

মেরি করোলির জন্ম হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু সত্তর বৎসর বয়সে। তাঁর অষ্টাবিংশতিতম উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার ঠিক পরেই।

দ্য সিক্রেট পাওয়ার—

“না-খেয়ে মরবে তুমি, এটা সহ্য করি কেমন করে?” [পৃঃ ৩

১

গিরিচূড়ার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে একখানা মেঘ। এলোমেলো, সুশুভ্র, দিগন্তবিসারী, সমুদ্রতরঙ্গের মাথায় মাথায় ফেন-কিরীটের মত। আকাশ পেরিয়ে যাচ্ছে মেঘখানা অপরূপ এক মহিমার ভঙ্গিমায়, নিজের সমারোহ নিয়ে নিজেরই যেন তার গর্ব অসীম।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বিস্তীর্ণ এক অঞ্চলের উপরে তুষারশুভ্র এক চাঁদোয়া ছড়িয়ে দিয়েছে এই মেঘখানা। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে, সিয়েরা-মেডার গিরিমালা অতিক্রম ক'রে এখন কোথায় চলেছে অনির্দেশ্য পূর্বমুখী অভিযানে, কে তা জানে!

সূর্য প্রায় পাটে বসেছে। তারই বহির্বলয় থেকে বিক্ষিপ্ত একটা বহ্নিশিখা এসে পড়েছে এই মেঘের নিম্নপ্রান্তে। সেখান থেকে আবার ঠিকরে নেমে এসেছে একখানা কাঠের ঘরের ঢালু ছাদে। গিরিমালার অপেক্ষাকৃত ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে গড়ানে একটু খোঁদলের ভিতর একান্ত সৌষ্ঠবহীন এই কুঁড়েখানা। সৌষ্ঠবহীন এবং নিঃসঙ্গ।

কুঁড়ের দরোজা খোলা। সমুখের সমতল আঙ্গিনাটুকুতে রোদে-পোড়া ঘাসের উপরে দু'খানা বেঞ্চ পড়ে আছে, তার একখানা রয়েছে টেবিলের কাজ করবার জন্য, অন্যখানা চেয়ারের। টেবিল বলে যেখানাকে মনে করা যেতে পারে, তাতে গাদা করা রয়েছে বই, খাতা, কাগজপত্র, বেশ পরিপাটিভাবে, সযত্নে সাজানো। আর চেয়ার যেখানাকে বলা যাচ্ছে, তাতে একটি লোক বসে আছে, হাতের বইখানার ভিতরে তন্ময় হয়ে।

এক নজর দেখেই যেসব মানুষকে ভাল লেগে যায়, এ-লোকটি তাদের দলের নয়। চোখমুখ নাকের দোষে? মোটেই তা নয়। চোখ মুখ নাক যে কী-রকম এর, হঠাৎ তা বোঝাই শক্ত, জমকালো

লম্বা দাড়িতে সারা মুখই এর ঢাকা। পোষাক-আশাক? তাও ঠিক সেইটুকুই আছে, যেটুকু না থাকলে চলেই না। ঢিলেঢালা পশমী পাজামা, একটা সাদা সার্ট। ব্যস্! ঐ দুটো পদার্থকে যথাস্থানে আটকে রাখবার জন্য একটা চামড়ার বেল্ট, ব্যস! জুতোটা কাপড়ের।

ঘন কালো চুল মাথায়, সে-চুলে চিরুনি পড়ে না কতকাল, কে জানে। সেই চুল দিয়েই লোকটা টুপির কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। মাথার উপরে ঐ সাদা মেঘখানা থাকা সত্ত্বেও গরম যে অসম্ভব, আর সেই গরম যে আগুন-ছড়ানো গ্রীষ্মের আকাশ থেকে তার ঐ অনাবৃত মাথাটার উপরেই ঝাঁপ খেয়ে খেয়ে পড়ছে, সেদিকে লোকটির হুঁসই নেই যেন।

কখনো তন্ময় হয়ে পড়ছে ও, কখনো লিখছে তন্ময় হয়ে। হাতের নাগালেই ছোট্ট একখানা নোট-বই, মাঝে মাঝে তাতে কয়েকটা ক'রে সংখ্যা বসাচ্ছে ও, আর কী-যেন সব হিসেব করছে সেইসব সংখ্যাকে ভিত্তি ক'রে। অত্যন্ত যেন ব্যস্ত সে। কিন্তু চিন্তার স্রোত খরবেগে বয়ে চলেছে, লেখা আর আঁক কষা অত দ্রুত এগুবে কেমন ক'রে? কপালে তার ভ্রূকুটি, নিজের কাজে নিজেই অখুশী সে। সময় বয়ে যায়, কাজ এগোয় না। মুস্কিল!

চারিদিক আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। সে-নিস্তব্ধতা যে কী-রকম, তা তারাই শুধু জানে, যারা এমনিধারা বহুবিস্তীর্ণ পার্বত্য প্রদেশে ঘোরাফেরা করেছে সাথী সঙ্গী বিসর্জন দিয়ে। মাথার উপর মুক্ত আকাশ, ডাইনে বাঁয়ে তুঙ্গ গিরির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। মানুষ ত দূরের কথা, একটা পাখী বা একটা পশুও চোখে পড়ে না।

সিয়েরা-মেডার অঞ্চলে লোকবসতি একান্তই কম। পাহাড়িয়া পথে পথে কদাচিৎ চলাচল দেখা যায় শুধুমাত্র মালবাহী খচ্চরের। সভ্যজগতের যানবাহন কুত্রাপি নেই এখানে। জনহীন, জীবনহীন এই গভীর গম্ভীর পরিবেশে এই একটা মাত্র দাড়িওয়ালা লোকের উপস্থিতি আর নিজের বইকেতাবে তন্ময় হয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থিতি, যে-কোন

বহিরাগতের চোখেই অস্বাভাবিক লাগবে। কিন্তু লোকটির নিজের ভাবে ভঙ্গীতে না প্রকাশ পাচ্ছে কোন চাঞ্চল্য বা অস্বস্তি, না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—লেখাপড়া বন্ধ করে সন্ধ্যার আগে ঘরে ঢুকবার জন্য কোন ব্যস্ততা।

সত্যিই এমনি সে তন্ময় নিজের কাজে যে, এখনও সে টের পায় নি যে সে একা নয় আর এই নির্জন পাহাড়ে, এই আসন্ন সন্ধ্যায়। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে একটি নারী ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তার দিকে দৃষ্টিপাতও এই দাড়িওয়ালা করে নি, তার পায়ের শব্দও সে শোনে নি। একটা ছোট বালতি মেয়েটির হাতে, তাতে দুধ।

দাড়িওয়ালার দুই গজ আন্দাজ দূরে বালতিটা নামিয়ে রেখে সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আর ঘন ঘন টানতে লাগল লম্বা লম্বা নিশ্বাস। হাঁপিয়েছে বেশ ও। যে-প্লাজা থেকে এলো ও, সেখান থেকে এই মরণকুঠি পর্যন্ত গোটা পথটাই একটানা চড়াই।

দাড়িওয়ালা তবু খাতাপত্র থেকে মুখ তোলে না। এক মিনিট যায়, দুই মিনিট যায়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেই ওকে। দাড়িওয়ালা নিজে যে দেখবার মত লোকই নয় একটা, এ-বিষয়ে দুনিয়ার অন্য লোক সবাই একমত যদিও, এ-মেয়েটির ধারণা অন্যরকম। সে নির্নিমেষে তাকিয়েই আছে ওর দিকে।

থাকুক দাড়িওয়ালার কথা, এই মেয়েটির কিন্তু দস্তুরমত সুন্দর চেহারা। লম্বা চওড়া দেহ, গায়ের রং রোদে-পোড়া তামাটে, মাথার চুল কালো, কালো চোখের চাউনি যেন বিজলীর ঝলক। স্পেনিশ রক্তে জন্ম এর, ওয়াকিবহাল লোক দেখলেই ধরে ফেলবে।

যা হোক, অবশেষে হুঁস হল দাড়িওয়ালার। বই সরিয়ে রেখে সে মাথা তুলে চাইল।

"আ-রে! এসেছ শেষ পর্যন্ত? কাল বলে গেলে আর তুমি আসছ না!"

মেয়েটি কাঁধ নাচালো—"না-খেয়ে মরবে তুমি, এটা সহ্য করি কেমন করে?"

"খুব দয়া তোমার। কিন্তু জেনে রাখ, না-খেয়ে মরার পাত্র আমি নই।"

"বাঃ, কিছুই যদি না-থাকে খাবার—"

"খুঁজে নেব! খুঁজে নেব! কোন-না-কোন জায়গায় পাবই কিছু। খুব অল্পই দরকার আমার।"

এইবার সে উঠল, দুই হাত মাথার উপর তুলে আলিস্যি ভাঙ্গল, তারপর কুঁজো হয়ে টিনের বালতিটা তুলে নিল হাতে, চলে গেল ঘরের ভিতর। এক মিনিট! তারপরই খালি বালতি নিয়ে ফিরল সে।

"এ যা মজুদ হল, পুরো দুইদিন চলবে আমার। বেশীও চলতে পারে। আগের দিন যা দিয়ে গিয়েছিলে, তা চমৎকার দই হয়ে গেল। দই খাচ্ছি, আর ফল খাচ্ছি প্রচুর। খাওয়ার দিক দিয়ে আমি রীতিমত বিলাসী একজন।"

পকেটে হাত দিয়ে সে গোটাকতক মুদ্রা বার করল— মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—"ঠিক আছে, কী বল?"

গুনে দেখে মেয়েটি বলল—"এটা মনে রেখো—এসব পয়সা প্লাজার, আমার একটাও নয়।"

দাড়িওয়ালা হেসে ফেলল—"আরে, সেকথা আর কতবার শোনাবে? দামটা যে তুমি নিচ্ছ না, তা আমি বিলক্ষণ জানি। নিচ্ছে প্লাজা, তোমাদের সেই কিম্ভূতকিমাকার হোটেল আর স্বাস্থ্যনিবাস, যার বাগানে গরম দেশের ফুল ফোটে অজস্র, কিন্তু যেখানে বাস করতে গেলে আরাম পাওয়া যায় না এক তিলও।"

কাঠের কুঁড়েখানার দিকে একটা ত্যারছা দৃষ্টি হেনে মেয়েটি বলল— "এখানকার চেয়ে কিছু বেশী অন্ততঃ পাওয়া যায় আরাম—"

"কী করে জানলে তুমি?"—দাড়িওয়ালা হাসল আবারও— "হোটেলের আরাম বলতে কী বোঝায়, তার কী অভিজ্ঞতা তোমার আছে, শুনি? প্লাজায় তোমার চাকরি হচ্ছে এখানকার জিনিস ওখানে নিয়ে যাওয়া, হেঁসেলের খাবার নিয়ে ডাইনিং টেবিলে পরিবেশন করা।

আর হয়ত সেই সব মূর্খ রোগীর সেবা করা, যারা ক্যালিফোর্নিয়াতে আসে অসাধ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্যের আশায়।"

"আরোগ্যের আশায় যারা আসে, তাদের যদি মূর্খ বলতে হয়, তোমায় তাহলে বলব কী? তোমার তো রোগই হয় নি! তুমি এসেছ কেন?"

দাড়িওয়ালা আবারও হাসছে—"ঠিক ধরেছ কিন্তু। রোগের কথাই বলি বটে, কিন্তু সেটা ধাপ্পা। আসলে আমার কিছুই হয় নি।"

"অকারণেও ধাপ্পা দেয় মানুষে?"

"ম্যানেলা! ম্যানেলা! এমন প্রশ্নও করতে আছে? অকারণে কেউ কখনো দেয় না ধাপ্পা। যেই দিক ধাপ্পা, যখনই দিক, সকলেই দেয় একই কারণে। সে-কারণ এই যে সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তার নেই। সেই ভীরুতারই আবরণ হল ঐ ধাপ্পা। ওটার আশ্রয় না পেলে আমাদের পাগল হয়ে যেতে হ'ত।"

এসব জটিল কথা ম্যানেলার মত মেয়ের বুঝবার কথা নয়। সে শুধু সুকৃষ্ণ ভুরুজোড়াকে কুঁচকে কপালে তুলে ফেলল। তারপর বলল—"এসব যা-তা কথার মানে হয় কিছু? এসব যখন শুনি তোমার মুখে, এক একবার মনে হয়, অন্য অসুখ কিছু না-থাকুক, মাথার ব্যারাম তোমার নিশ্চয়ই আছে।"

এবার দাড়িওয়ালা গম্ভীর হয়ে গেল। বলা বাহুল্য এ-গাম্ভীর্যও ধাপ্পা একটা—"ঠিক ধরেছ। খুব বুদ্ধি কিন্তু তোমার ম্যানেলা। মাথার অসুখই বটে। তারই জন্য এখানে এসেছি আমি। ক্ষয়রোগই! ফুস্‌ফুসে নয়, মগজে! মগজের ক্ষয়রোগ প্লাজার স্বাস্থ্যনিবাসে সারে কখনো? অত আনন্দ, অত ঝলমলানি, মেলামেশার অত হুল্লোড়—"

হঠাৎ থেমে গেল দাড়িওয়ালা। মিশকালো সুপুষ্ট গোঁফজোড়ার নীচে সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে গেল একবার। ম্যানেলার মনে হ'ল, হাসছে বুঝি ও।

ও কথা শেষ করল—"সেই জন্যেই আমি আজ এখানে।"

"প্লাজাকেও তুমি দেখতে পার না, আমাকেও তুমি দেখতে পার না। আমি তোমার চোখে মানুষই নই যেন!"

"একদম না। ঠিক ধরেছ ম্যানেলা, একদম না। কিন্তু কেন তুমি মানুষ বলে গণ্য হবে আমার চোখে, সেই কথাটা বলতে পার তুমি?"

ম্যানেলার গলা জড়িয়ে আসছে। ধরা-গলায় সে বলল—"না, তা পারি না বলতে। বলতে পারি শুধু এই কথা যে তোমার বাঁদী হয়ে থাকতে চাই আমি। তোমার সেবা করব প্রাণ দিয়ে, চাই শুধু এইটুকু। আমি রাঁধতে পারি, সেলাই করতে পারি, ঝাঁট-পাট ধোয়া-মোছা সবই পারি আমি। গেরস্থালির যত কিছু কাজ, সবই আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারতে, সারাদিন লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতে, আমায় পায়ে ঠাঁই দিলে। কুকুর যেমন ক'রে পাহারা দেয় তার মালিককে, ঠিক তেমনি ক'রে আমি আগলে রাখতাম তোমাকে।"

দাড়িওয়ালার চোখে এক অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টি, তাতে বিস্ময় খানিকটা, করুণা খানিকটা। দু'জনেই নীরব কিছুক্ষণ। পাহাড়ের চিরন্তন স্তব্ধতা আরও যেন নিবিড় হয়ে এল, চেপে বসল দু'জনেরই উপরে। সেই আকাশজোড়া সাদা মেঘখানা পরিপূর্ণ আলস্যে অঙ্গবিস্তার করে রয়েছে ঘনায়মান অন্ধকারের বুকে।

কিছুক্ষণ! খুবই অল্পক্ষণ! তারপরই কঠিন পুরুষের মুখ থেকে বেরুলো ব্যঙ্গের উক্তি—"মাইনে? ম্যানেলা, মাইনে? এরকম একটা বাঁদীর, এরকম একটা কুকুরের জন্য মাইনে আমাকে কী দিতে হবে?"

ম্যানেলার মাথাটা নুয়ে পড়ল, দাড়িওয়ালার নিষ্পলক শাণিত দৃষ্টির সমুখে সে চোখ মেলে চাইতেই পারছে না। তার কানে এসে ঢুকছে দাড়িওয়ালার উক্তি। উক্তি তো নয়, মর্মভেদী-শর এক একটা।

"কোন মাইনে লাগবে না, বলবে তুমি। কোন মাইনেই নয়, একমাত্র একটু ভালবাসা ছাড়া। আমি জানি, আমার প্রশ্নে ঐ

উত্তরই দিতে চাইছ তুমি। কিন্তু গোড়াতেই গলদ করেছ তুমি ম্যানেলা। যে-জিনিসটিই তুমি চাইছ, সেই জিনিসটিই ত্রিভুবনে নেই, আছে জান্তব আকর্ষণ। একটা সম্মোহন শক্তি, চুম্বকের মত যা দুটো প্রাণীকে পরস্পরের দিকে টানে। তা ছাড়া আর কিছু নেই বাস্তব জগতে। কবির কল্পনায় অবশ্য অনেক কিছুই আছে। তবে সর্বরক্ষা যে কবির কাব্য সম্পর্কে কোন কিছুই জানা নেই তোমার। অতএব আমার কথাটাকে সত্য বলে মেনে নিতে তোমার অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।"

ম্যানেলার কৃষ্ণতার ডাগর চোখ দুটিতে জল এসে গিয়েছে ততক্ষণ। "কেবল কথা! কেবল কথা তোমার! যে সব কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না আমি, সেই সব কথা। বুঝি না কিছুই, তবে এটুকু জানি যে তোমার সব কথাই আগাগোড়া ভুল। ভালবাসা নেই? এই যে প্রতি সকালে আর প্রতি সন্ধ্যায় তোমার জন্য আমি ভগবানের দয়া ভিক্ষা করি, এটা কোথা থেকে আসে? এই যে তোমার সেবায় আমি আঙ্গুলের হাড় ক্ষইয়ে ফেলতে পারি, এ-নিষ্ঠাই বা আসে কোথা থেকে? এই যে তোমাকে অসুখ বা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে পারি আমি, একে কী নাম দেবে তুমি?"

"নাম দেব আত্মপ্রতারণা। এক ধরনের নারী সত্যিই আছে, পছন্দসই পুরুষকে সে অতি অনায়াসে দেবতার আসনে বসিয়ে ফেলে। সে-পুরুষটা হয়ত আসলে পিশাচ ছাড়া আর কিছু নয়।"

বলতে বলতে দাড়িওয়ালার চেহারায় একটা এমন হিংস্র, ক্রুর প্রকৃতির আভাস ফুটে উঠল যে আঁৎকে উঠে বুকের উপরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে বাধ্য হ'ল ম্যানেলা। "পিশাচ? বল কী, পিশাচ?"— অস্ফুট উক্তি বেরুলো তার মুখ থেকে।

আর তাই দেখে আর তাই শুনে দাড়িওয়ালা খল খল ক'রে হেসে উঠল একটা বিদ্রূপের হাসি—"ভয় পেয়ে গেলে? এ্যাঁ, ভয় পেয়ে গেলে ম্যানেলা? ক্যাথলিক মানুষ তুমি, প্রেত পিশাচে বিশ্বাস

করবেই ত! তা বেশ, বুকে পবিত্র ক্রুশ এঁকেছ, আর তোমার ভয় নেই। আমার মত পিশাচের কবল থেকে আত্মরক্ষার ঐ তো উপায়!”

এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণী এইবার আত্মাভিমান জাগিয়ে তুলল ম্যানেলার, যে-আত্মাভিমান এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল সুগভীর অনুরাগের নীচে। এইবার মাথা তুলে ম্যানেলা ঘৃণার সুরে কথা কইতে লাগল দাড়িওয়ালার সঙ্গে—“এবারে কিন্তু সত্যিই আমার সন্দেহ হচ্ছে যে লোক তুমি সৎ নও। হৃদয় বলে কোন জিনিস তোমার নেই। ভালবাসার যোগ্য পাত্র তুমি নও।”

“ঠিক! ঠিক! ঠিক ম্যানেলা”—প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ভান করল দাড়িওয়ালা—“চাঁদমারির ষাঁড়ের চোখে* তিন তিনবার গুলি বিঁধিয়েছ তুমি। এক, লোক আমি সৎ নই। দুই, হৃদয় বলে কোন জিনিস আমার নেই। তিন, ভালবাসার যোগ্য পাত্র নই আমি। তিনটি কথাই তুমি বলেছ খাঁটি সত্যি। এইবার যাও, আর এই অসৎ, হৃদয়হীন, ভালবাসার অযোগ্য পিশাচটার কাছে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। প্লাজায় এতক্ষণ ডাকাডাকি পড়ে গিয়েছে তোমার জন্য। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। অতিথিরা ডিনারে বসবেন এইবার।”

“আমি তো যাবই, কিন্তু তোমারই বা এখানে থাকার দরকার কী? ঐ সব বইখাতা সামনে নিয়ে প্লাজার একটা ঘরেও তো তুমি বসতে পার!”

“যার যেমন রুচি! ম্যানেলা, কৌতূহল ভাল নয়। চেহারাতেই লম্বা চওড়া সুন্দরী হয়ে উঠেছ তুমি, ঠিক গ্রীক পুরাণের দেবরাজ্ঞী জুনোর মত। অন্তরের দিক দিয়ে তুমি কিন্তু এখনো এতটুকুন বাচ্চা রয়ে গিয়েছ। সেদিক দিয়েও যেদিন তুমি বেড়ে উঠবে, সেইদিন বুঝতে পারবে যে মানুষ যতরকম পাপ করতে পারে, তার মধ্যে সব-চেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে কৌতূহল। আদি-জননী ঈভ তাঁর কৌতূহল দমন করতে পারেন নি বলেই স্বর্গচ্যুত হতে হয়েছিল বাবা আদমকে। আর তারই ফলে পেটের রুটি উপার্জনের জন্য আমাদের আজ মাথার

* চাঁদমারির মধ্যবিন্দু।

ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে উদয়াস্ত খেটে খেটে। তুমি যাও তো এইবার লক্ষীটি, রাত হয়ে গেল।”

“এই রাতে তুমি এই তেপান্তর পাহাড়ের মরণকুঠিতে একা একা পড়ে থাকবে, এই কি ভাল লাগে তোমার ?”

“ম—রণ কুঠি ?”—প্রথমটা যেন ম্যানেলার কথা বুঝতেই পারল না দাড়িওয়ালা। তারপরে হেসে উঠল সশব্দে—“ওঃ, বুঝেছি। যেসব ক্ষয় রোগীর সেরে উঠবার কোন আশা নেই, অথচ যাওয়ার মত কোন জায়গাও নেই নিজের, তাদেরই শেষ আশ্রয় হিসেবে প্লাজার মালিকেরা তৈরী করে রেখেছেন এই কাঠের ঘরখানা। সে-অর্থে এটা মরণকুঠিই বটে। নামটা লাগতাই, যদিও এ-নাম আগে শোনা ছিল না আমার। কিন্তু কী বলছিলে ? ভাল লাগে কিনা এই মরণকুঠি আমার ? না যদি লাগে, উপায় কী তার ? মরণকুঠিতে থাকাই যখন আমার দরকার হয়েছে উপস্থিত, থাকতেই হবে ! তুমি বলছিলে, এইসব বইখাতা নিয়ে প্লাজার একটা ঘরেও বসতে পারি আমি। সে তোমার ভুল। পারি না তা। কেন পারি না। তা বোঝাতেও পারি না তোমাকে। তা বুঝবার মত বুদ্ধিই নেই তোমার।”

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্যানেলা বলল—“তোমার সবই সৃষ্টিছাড়া। মরবার আগে যে-সব ক্ষয়রোগী আসে এই মরণকুঠিতে, তারাও একটা ক’রে নার্স সঙ্গে আনে। তুমি তাও আন নি। আমাকে না-হয় সেই নার্স হিসেবেই থাকতে দাও এখানে !”

“দিতাম, যদি সত্যিই ক্ষয়রোগী হতাম আমি। রোগই যার নেই, সে নার্স দিয়ে করবে কী ? আর রান্নাবান্না যার নেই, তার বাড়ীতে এসে দাসী বা রাঁধুনীই বা করবে কী ? আমি খাই শুধু দুধ আর রুটি। যা হপ্তায় দুইবার করে পাঠিয়ে দেয় প্লাজার ম্যানেজার। হ্যাঁ, যথেষ্ট রসদ জমে গিয়েছে ঘরে, এখন পুরো তিন দিন আর আসার দরকার নেই তোমার। বুঝলে তো লক্ষীটি ?”

“তিন দিন ? আমি আর কক্ষণোই আসব না তোমার এই

অলক্ষুণে মরণকুঠিতে।”—বলতে বলতে ম্যানেলা পিছন ফিরে দৌড় দিল আধ মাইল দূরের প্লাজার দিকে।

দাড়িওয়ালা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। “ভ্যালা গেরো!”—বলল নিজের মনে। কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে তুলতে তুলতে একবার মুখ তুলে তাকালো পূবের আকাশ-পানে। সাদা মেঘখানা আর চোখে পড়ছে না। লুকিয়ে পড়েছে সর্বগ্রাসী অন্ধকারে। তবু সেই পূবের আকাশের নিবিড় অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ নয়নে সে তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে।

ঐ দিকে! বহু দূরে! সেদিনও ছিল এই দাড়িওয়ালা জংলী। ঘোরাফেরা করত মহানগরীর অগ্রগণ্য অভিজাত সমাজে। না, অর্থভিত্তিক আভিজাত্যের উপরে দাবি তার কোন দিন ছিল না, নিজের তার আগ্রহও ছিল না সে-সমাজে মেলামেশা করবার। তবু তাকে যেতে হয়েছিল। একটা দুর্বার আকর্ষণে পড়ে যেতে হয়েছিল। সে-আকর্ষণ এক দীপ্তিময়ী স্বর্ণকেশী তরুণীর। সিয়েরা-মেডার পাহাড়ের এই ভূতুড়ে মরণকুঠিতে তার অজ্ঞাতবাস, সেই জ্বলন্ত পাবকশিখা থেকে দূরে পালাবার জন্যই প্রধানতঃ।

না-পালালে তার জীবনের সাধনা ভস্মসাৎ হয়ে যেত এতদিন, সেই বহ্নিজ্বালার ছোঁয়াচ লেগে।

২

জীবনের সাধনা !

সত্যিই রোজার সীটনকে সভ্যজগৎ থেকে পালাতে হয়েছিল ঐ একটিমাত্র প্রয়োজনে, সাধনার অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য। যতদিন সিদ্ধিলাভ না হয়, ততদিন সংসারের মোহজালে জড়িয়ে পড়লে চলবে না তার।

বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব সে চোখে দেখেছিল। লক্ষ মানুষের অধ্যুষিত সমৃদ্ধ নগরী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহুবিস্তীর্ণ একটা একটানা ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'ল; সে-কাহিনী তাকে খবরের কাগজের তারবার্তা থেকে জানতে হয় নি। যুদ্ধক্ষেত্র সে চর্মচক্ষে দর্শন করেছে। রক্তের নদী বইছে মাঠে প্রান্তরে পাহাড়ে উপত্যকায়, মাঝে মাঝে গাদা হয়ে পড়ে আছে হতাহত মানুষের দেহ, তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠছে ধোঁয়াটে আকাশ বিদীর্ণ করে, এসব তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জিনিস।

তখন তরুণ যুবক ও। মনে দাগ কেটে গিয়েছিল সেই সব দৃশ্য। সে-অনুভূতির জ্বালা এখনও তাকে উন্মাদ করে তোলে মাঝে মাঝে। ভোলে নি সে কিছুই। সেদিনে ভগবান সাক্ষী করে যে-প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছিল, ভোলে নি তার কথাও। সেই প্রতিজ্ঞাপূরণের জন্যই তার এই যুগব্যাপী বিজ্ঞান সাধনা। শক্তিমদে মত্ত এই যে জাতিগুলি পৃথিবীর, এদের শক্তির অহঙ্কার সে চূর্ণ করবে। গায়ের জোরে অন্যের স্বাধীনতা হরণের উদগ্র লালসা এদের, রোজার সীটন মুষল হানবে সেই লালসার শিরে।

তারই জন্য শক্তি-আহরণের সাধনা তার। বিশ্বের বুক থেকে স্বৈরতন্ত্রী শাসন মুছে ফেলবার সাধনা। এ-সময়ে তার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিলাসিনী সমাজসিংহিনীদের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করা। সর্বপ্রযত্নে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা সেই শ্রেণীর নারীর, মর্গানা রয়াল যাদের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাণঘাতিনী।

বসে বসে ভাবছে দাড়িওয়ালা সীটন। আঁধার কেটে গিয়ে আকাশে উঠেছে বিরাট বড় একটা চাঁদ। ক্যালিফোর্ণিয়ার আকাশে চাঁদটা যত বড় আর যত উজ্জ্বল দেখায়, তত আর কুত্রাপি দেখায় না পৃথিবীর। কত প্রশস্তিই না গেয়েছেন মার্কিন কবিরা এই অতিকায় সুধাকরের !

চাঁদ উঠছে, ঝলমলিয়ে উঠছে খাড়া খাড়া সাদা পাহাড়, ঝোপে-ঝাড়ে শুরু হয়েছে আলো-ছায়ার ঝিলিমিলি লুকোচুরি। ম্যানেলা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ঐ যে পায়ে-চলা সুঁড়ি-পথটা, ঐ পথ বেয়ে নামতে নামতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এক টুকরো খাড়া উৎরাইয়ের গহ্বরে। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয় সীটনের। কষ্ট আছে বরাতে ওর। কিন্তু সীটন তার কী করতে পারে ?

কিছুই না ! কিছুই না ! করার জিনিস থাকতে পারত একটাই শুধু। নিজের সাধনা বিসর্জন দিয়ে গেরস্ত-জীবনের নোংরামিতে ডুবে যাওয়া। তা তাই যদি সে করবে, ম্যানেলা সোরিসোর মত জ্ঞান-গম্যিহীনা একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে কেন করবে ? সে তো ইচ্ছে করলেই মর্গানা রয়ালের পাণিগ্রহণই করতে পারত, সেই ধনকুবের-দুহিতার অক্ষয় স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে পারত, গার্হস্থ্য পরিবেশের ক্লেদ আর গ্লানির উপরে নয়নমনোহর একটা সোনালি প্রলেপ লাগিয়ে নেবার জন্য !

ভাবছে, আর সেইখানটার দিকেই ফিরে ফিরে চাইছে সীটন, যেখানে সে শেষ দেখতে পেয়েছিল ম্যানেলাকে ! হঠাৎ—একি দৃষ্টিবিভ্রম হ'ল নাকি তার ? না, যাবে-যাবে-করেও এখনো গিয়ে উঠতে পারে নি ম্যানেলা ? ওখানে একটা নারীমূর্তি দেখা যায় না ? ম্যানেলা উঠে আসছে না চড়াই বেয়ে ? ঐ যে একটা মাথা উঠেছে ! ঐ যে বুক ! ঐ যে নিম্নাঙ্গ ! পরিপূর্ণ মনুষ্যমূর্তিই তো একটা ! নারীমূর্তি ! ম্যানেলা ফিরে এল ? অশেষ ঝামেলা আবার ! অবুঝ মেয়েটার উপরে রূঢ়ও তো হওয়া যায় না !

কিন্তু ও কি ম্যানেলা ? ম্যানেলার মাথার চুল অমন সোনালি

তো নয়! এ যে একেবারে ঝলমল করছে পরিস্ফুট জ্যোছনায়! চুলও অবশ্য দেখবার মত। দস্তুরমত সুকেশীই বলা যায় তাকে। কিন্তু তার চুল তো সোনালি নয়, মিশ্‌কালো! কালো চুল কখনো জ্বলে জ্বলে উঠতে পারে আগুনশিখার মত?

না, ম্যানেলা নয়। তার মাথায় সোনালি চুল নেই। নেই, সীটনের পরিচিতা অন্য কোন মেয়েরই মাথায়, একমাত্র মর্গানা রয়ালের ছাড়া।

কিন্তু মর্গানা রয়াল? সেই ধনকুবের রয়ালের উত্তরাধিকারিণী? তাকে তো নিউইয়র্কে দেখে এসেছিল সীটন! সেখানকার সৌখিন সমাজে পাকাপোক্ত রকম অধিষ্ঠিতাই দেখে এসেছিল। সম্রাজ্ঞীর গৌরবে অধিষ্ঠিতা। সে-মর্যাদার আসন ত্যাগ করে মর্গানা রয়াল এই সুদূর ক্যালিফোর্ণিয়ার জনহীন পাহাড় সিয়েরা-মেডারে এসে হানা দেবে কিসের প্রয়োজনে? আর যদিই বা আসে, মনোরম শৈলাবাস প্লাজা হোটেলে বিলাসবহুল ফ্লাট সংগ্রহ না করে মরণকুঠির দিকে সে পা চালিয়ে দেবে কেন? বিশেষ করে এই রাত্রি এক প্রহরে? না, অসম্ভব। মর্গানা ও কখনো হতে পারে না।

কিন্তু ঐ সোনালি চুল—?

শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নাত সুশুভ্র মূর্তিখানি, তার মাথা থেকে নেমে বুকে কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে স্বর্ণকেশের সম্ভার। নারীমূর্তি? না, আকাশ থেকে অবতীর্ণা নিঃসঙ্গ বিহঙ্গিনী? বাতাসটা পড়ে গিয়েছে হঠাৎ। মূর্তিটির অঙ্গের বসনে কাঁপুনি নেই বিন্দুমাত্র। পরতে পরতে বরতনুকে আবৃত করে রেখেছে সেই বসন, ঠিক যেন অর্ধ-বিকশিত ম্যাগনোলিয়া কুসুমের গায়ে পাপড়ির উপরে পাপড়ি।

সীটন তাকিয়ে আছে, তার চোখের সামনেই নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে সেই মূর্তি, অনায়াসে ভেসে আসছে হাওয়ায়, ঠিক যেন একটা বায়ুর বুদ্বুদ। পরিপূর্ণ জ্যোছনায় ফুটে উঠছে একখানা সুন্দর মুখ। জ্যোছনাবরণী রমণীর মুখ, সোনালি কেশপাশের কাঠামোতে

আবদ্ধ। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। সীটন উঠে দাঁড়াল তার বেঞ্চি ছেড়ে।

"চমক লাগিয়ে দেওয়ার মত আবির্ভাব একখানি—" বলল সীটন —"নিখুঁত থিয়েটারী ঢং। তোমারই যোগ্য সবরকমে।"

একটা হাসি। বরফ-ঝরা শীতের রাতের স্লেজ থেকে যেমন স্পষ্ট শাণিত ঘণ্টার ধ্বনি বেজে ওঠে, ঠিক তেমনি স্পষ্ট, শাণিত হাসি। সেই হাসির পরেই প্রশ্ন—"নিউইয়র্ক থেকে পালিয়ে এলে যে বড় ?"

সীটনের মুখে জবাব যেন তৈরীই ছিল—"না-এসে করি কী ? যা বিরক্ত ক'রে তুললে তুমি !"

আবার সেই হাসি, শীতল, শাণিত। ঢেউ-খেলানো জ্যোছনা-জালের ভিতরে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন অশরীরিণী এক পরীরমণীর মত, কিন্তু হাবভাবের দিক দিয়ে তার অতিবাস্তব আধুনিকতা পুরোমাত্রায় প্রকট। সীটনের অভব্য উত্তর যে তার মনে একটুও রেখাপাত করে নি, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মাথাটা একবার নেড়ে দিয়েই সে তা বুঝিয়ে দিল সীটনকে।

"বিরক্ত ? তুমি যে নিজের ভাল নিজে বোঝো না ! এক পথের পথিক তো দু'জনে ! তুমিও বিজ্ঞানের গবেষণা করছ, আমিও বাহ্যতঃ নাচে গানে ডিনারে পিকনিকে আসক্ত একটা হতচ্ছাড়ী বিলাসিনী হলেও, ভিতরে ভিতরে সে-গবেষণা আমিও করে থাকি কিছু কিঞ্চিৎ। সমধর্মীর দরদ একটু না-থাকবে কেন তোমার জন্য ! আমি ওদিকে চিন্তা করছি কীভাবে তোমার কাজে আমি সাহায্য করতে পারি, তুমি এদিকে নিঃশব্দে কেটে পড়লে। কিন্তু মর্গানা রয়ালকে চেনো না ত ! ত্রিভুবনে হেন স্থান নেই, যেখানকার ছবি জাজ্বল্যমান নয় তার দৃষ্টির সামনে। এসে ধরেছি কিনা ঠিক ? কিন্তু অসুস্থতার এই ভান কিসের জন্য ? অবশ্য জায়গাটা বেছে নিয়েছ ভালই। ঐ হোটেলে—স্বাস্থ্যনিবাসে মিলিয়ে যে-জগাখিচুড়িটা ওখানে ওরা গড়ে রেখেছে, প্লাজা যার নাম, তার চেয়ে এই নির্জন পাহাড়ের ঐ কাঠের কুঁড়ে ঢের ভাল জায়গা।"

বলতে বলতেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছে—"তোমার কুঁড়ের প্রশংসা করছি বলে যেন ধরে নিও না যে এইখানেই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবার বাসনা আমার। প্লাজার নিন্দা যতই করি, উঠেছি আমি সেইখানেই।"

"মোটর সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই ?"—সীটনের কথায় পরিস্ফুট ব্যঙ্গ—"চাকর কতগুলো এনেছ ? কতগুলো বাক্স ? আর কত ডজন পোষাক তাতে ?"

"সে-খবরে তোমার কী দরকার ?"—ঝাঁঝিয়ে উঠল মর্গানা—"কারও মন রেখে ত আমায় কাজ করতে হয় না !"

"ঐতেই ত খেয়েছে—" জবাব দিল সীটন।

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মহাশূন্যে পাল তুলে চলেছে চাঁদের রূপোলি বজরা। রুক্ষ রিক্ত পাহাড়ের গায়ে মাথায় গলিত রজতের প্লাবন যেন নেমে আসছে তা থেকে। আধেক সেই প্লাবনে উজ্জ্বল, আধেক ছায়ায়-ঢাকা আবছা-আঁধার, দু'টি মূর্তিকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত, অপার্থিব।

হঠাৎ মর্গানা দুই হাত ছড়িয়ে দিল আকাশের দিকে তাকিয়ে—"এত দূর আসা সার্থক হয়েছে আমার। উঃ, কী ম-স্ত চাঁদ এই ক্যালিফোর্ণিয়ায় ! দেখবার মত সত্যি।"

সীটন নীরব, অবিচলিত।

"তোমার কিন্তু কোন আনন্দ নেই এসবে"—বলে যাচ্ছে মর্গানা—"তুমি তো মানুষের আকারে ভালুক কিনা একটা ! জ্যোছনার কোন আবেদন নেই তোমার কাছে।"

"কী আবেদন থাকতে পারে ওর ? একটা বুদ্ধিমান মানুষের কাছে ? চাঁদ একটা মরা উপগ্রহ। তার নিজস্ব আগুন আজ আর কিছু নেই, নিবে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে যুগ যুগ আগে। এখন ওর ঐ যে আলো, ও তো সূর্যের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া ! নারীদের মতই ! অন্যের আলোকেই যা কিছু দীপ্তি তার। নারীদের মতই বিশেষ করে তোমার মত।"

একখানা হাত অপরূপ ভঙ্গীতে দুলিয়ে সীটনকে কুর্নিশ জানালো মর্গানা। হাওয়ায় যেন দুলে গেল একটা লিলি ফুল। "কী ভদ্র কথাবার্তা আমাদের নাইট মহাশয়ের! ধন্যবাদ!"—পাহাড়ের গায়ে রোদে-পোড়া ঘাসের উপরে আধ-শোয়া ভাবে বসেই পড়ল সে।

সীটন তার দিকে তাকালো এমন দৃষ্টিতে, যেন পারলে সে এক্ষুণি ভস্ম করে ফেলে মর্গানাকে।

"ভদ্র কথাবার্তা, ভদ্র আচরণ, এসব কী করে আমার কাছে প্রত্যাশা কর তোমরা? সারা দুনিয়ায় এমন একটু নিভৃত স্থান মেলে না, যেখানে বসে একটা বিজ্ঞানের ছাত্র নিজের পড়াশুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে। যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই তোমরা আছ পিছনে। কেন? এ-গোয়েন্দাগিরির তাৎপর্য কী?"

মর্গানা শান্তভাবেই উত্তর দিল—"তাৎপর্যের কথা তো আগেই বলেছি। তোমার ঐ পড়াশোনা গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইছিলাম আমি। নিউইয়র্কে থাকতে এমন কিছু কিছু আভাস তুমি দিয়েছিলে যে অতি উঁচুদরের একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে গবেষণায় রত আছ তুমি। আমি ভাবলাম—বেচারী সীটনের একটা নিজস্ব ল্যাবরেটরি যদি থাকে এসময়, অবশ্যই গবেষণার ব্যাপারে তার সাহায্য হতেও পারে। তারই তোড়জোড় করছি আমি, এদিকে তুমি নিজেই হয়ে গেলে হাওয়া। আমার মুস্কিল হয়েছে আমি ভয়ানক জেদী মানুষ—"

বাধা দিয়ে সীটন বলল—"জেদ আসে পয়সার গরম থেকে। আমি তোমার পয়সারও প্রত্যাশী নই, তোমার জেদেরও পরোয়া করি না। তোমায় না বলে যে আমি পালিয়ে এলাম, এতেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে তোমার কোন সাহায্যই আমি নেব না। আমার এ-গবেষণা অতি জটিল এবং অতি গোপনীয়। এতে যদি আমি সিদ্ধি লাভ করি, বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব, বিপর্যয় এসে যাবে একটা। এর কথা কি আমি পাঁচজনকে জানাতে পারি? তাই আমায় পালাতে হ'ল।"

সীটনের কথার শেষাংশের উপরে কোন মনোযোগই দেয় নি মর্গানা। তার মাথায় ঘা দিয়েছে ঐ 'বিপ্লব' আর 'বিপর্যয়' শব্দ দুটো। সে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল—"বিপ্লবই বল আর বিপর্যয়ই বল, তা দিয়ে দরকার কী আমাদের? আমাদের এই পৃথিবীটা যেভাবে চলছে ইদানীং এমন তো খারাপ কিছু দেখছি না। এই ভাবেই তা চলতে থাকে যদি, তাতে আপত্তি কী তোমার?"

কাঁধটা দুলিয়ে হাত দুখানা নেড়ে সব শেষে এলায়িত কেশদাম সে কপালের উপর থেকে পিছনে ঠেলে দিল। চাঁদের আলো যেন জলের মতই ঢেউ দিয়ে গেল সেই এলো চুলে। সীটন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করছে তখন—"সত্যি সত্যি কী মতলবে এসেছ তুমি এই দুনিয়া বহির্ভূত দেশে?"

"সত্যি সত্যিই বলছি, তোমাকে একবার দেখে যাওয়ার জন্য।"—হাসিমুখে স্বীকার করল মর্গানা—"এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি কিনা! বহু, বহুদিনের জন্যই যাচ্ছি। ইণ্ডিয়ানেরা যেমন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ত আগের দিনে, তেমনি। যত শত্রু সামনে পড়বে, মাথার চামড়া তুলে নিয়ে নিজের কোমরবন্ধে ঝোলাব। বুঝতে পারলে না, এর নির্গলিতার্থ? আমি ইউরোপে যাচ্ছি—"

"যেমন ধনবতী মার্কিন মহিলারা সবাই যায়। ইউরোপের কোন রেস্তহীন ডিউক বা প্রিন্সকে দড়ি গলায় বেঁধে নিজের গোয়ালে টেনে তুলবার জন্য।"

"নাহে না",—হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে মর্গানা, "আদৌ তা নয়। অত বোকা এই মর্গানা রয়াল নয়। প্রিন্স দিয়ে আমি করব কী, নিজেই যখন 'রয়াল'? বৈজ্ঞানিক গবেষণা তুমিও যেমন ক'রে যাচ্ছ, আমারও তো তেমনিই কিছু করার বাধা নেই? আমিও এমন কিছু আবিষ্কার করেছি, যার দৌলতে তোমার মত যে কোন মানুষকে আমি এইভাবে গোল্লায় দিতে পারি"—বলতে বলতে একটা আঙ্গুল সমুখের অবারিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে সে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আনল, আর সেই বৃত্তের ফাঁক দিয়ে ফুঁ দিল একটা—"এক নিশ্বাসে খতম! দূরে

বসে ফুঁ দেব, আর সেই ফুৎকারে সিয়েরা মেডারের দুধরুটিভোক্তা নরাকার ভালুকটা নস্যাৎ হয়ে যাবে। একেবারে উধাও। কোথাও আর এক টুকরো মাংস বা হাড়ও দেখতে পাবে না তার।"

সেই নরাকার ভালুকটা তখন রক্তচক্ষু পাকিয়ে নিরীক্ষণ করছে তাকে। তার কথা যখন শেষ হল, সে কড়া-মেজাজে বলে উঠল, "এসব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভাল হচ্ছে না তোমার। মেয়ে-মানুষ আবার বিজ্ঞানের বুঝবে কী?"

অমায়িকভাবে মর্গানা বলল—"তা তো সত্যিই! অর্থাৎ পুরুষদের মতে তাই তো সত্যি! সেইজন্যই মাদাম ক্যুরির নাম যেখানে অনিবার্যভাবেই উঠে পড়ে, সেখানে তাড়াতাড়ি, সে-নামের আগে তারা জুড়ে দেয় মসিয়ঁার ক্যুরির নাম। যদিও ব্রহ্মাণ্ডের সবাই জানে যে রেডিয়াম যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি মাদাম ক্যুরি, মসিয়ঁার ক্যুরি নন।"

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য সীটন বলল—"যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! রাত যে দশটা বাজল, তা জানো তুমি? নিশ্চয়ই জানো। কিন্তু প্লাজার লোকেরা—"

"তারাও জানে"—বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে মর্গানা বলল—"তাদের যেটুকু জানার দরকার, তা জানে তারা। অর্থাৎ জানে যে আমার অর্থ অঢেল। যার অঢেল অর্থ, সে কী করছে না করছে, যা করছে তা শোভন কি অশোভন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি যদি সারা রাত পাহাড়ে পাহাড়ে একটা নরাকার ভালুকের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াই, কেউ কিছু বলবে না তাতে, কারণ আমার অর্থ আছে অঢেল। আমি যদি প্লাজার ছাদে বসে নীচের তলার বাসিন্দা ভদ্রলোকদের জানালার উপর দিয়ে পা ঝুলিয়ে দিই, লোকে তাতে ধন্য ধন্য করবে আমাকে। কারণ অর্থ আমার অঢেল।"

মুখ-চোখ বিকৃত ক'রে সে হাস্যকর ভঙ্গী করল একটা—"পয়সা কী ক'রে খেলাতে হয়, জানে যারা, অনেক রকম মজাই তারা করতে পারে।"

"তুমি জানো নাকি পয়সা খেলাতে?"—বিদ্রূপ করল সীটন।

"তা ত বোধ হয়, জানি মোটামুটি"—মাথাটা একপাশে কাত করে মর্গানা বলল—"জানি এবং মজাও করি। লোভী, মর্যাদাবোধহীন মানুষের সমুখে দু'টো ডলার ফেলে দিয়ে কত কীই যে করিয়ে নিই তাদের দিয়ে, দেখলে তুমি হাসবে। তবে তোমাকে নিয়ে মজা করা ঘটে উঠল না আমার। ভেবেছিলাম তোমার গবেষণার অর্থটা আমিই যোগাব, আর সে-গবেষণায় সাফল্যলাভ ক'রে তুমি একটা বিপ্লব—বিপ্লব বা বিপর্যয় আনবে বিশ্বে, তখন তাই দেখে চূড়ান্ত মজা লুটব আমি। তা সেটা আর হ'ল না। হ'ল না যে তার কারণ তুমি সত্যি সত্যি মানুষ নও, নরাকারে ভালুক তুমি একটা।"

সীটন দাঁত দেখাল, কালো দাড়ি আর কালো গোঁফের মধ্যে দিয়ে। হাসল? না ক্রোধ প্রকাশ করল?

যাই সে করুক, মর্গানা নিজের কথাতেই মশগুল নিজে—"না, তোমায় নিয়ে মজা করা ঘটল না আমার। কী কারণে যে তুমি পালিয়ে এলে নিউইয়র্ক থেকে, রহস্যই রয়ে গেল আমার কাছে। নিউইয়র্কে অনেক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, কারণটা বলতে পারে নি কেউ। এখানে আর কাকে জিজ্ঞাসা করব? ঐ চাঁদ! —ওহে ও বিশাল চাঁদ ক্যালিফোর্ণিয়ার! তুমি জানো যে সীটন পালিয়ে এল কেন? কিংবা যাবতীয় অখৃষ্টান পুরাণের দেবদেবী পরী আর বনদেবী জলদেবীর দল, কেউ তোমরা জানো সে কথা, যে সে পালিয়ে এল কেন? কেন? কেন? কেন?"

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের একটা চাবুক হানল সীটন—"তোমার উচিত ছিল রঙ্গমঞ্চে নটী হওয়া—"

"সেক্সপীয়ারের মতে গোটা বিশ্বই ত রঙ্গমঞ্চ!"—আকাশের সেই মস্ত চাঁদটার দিকেই সে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, এইবার দৃষ্টি নামিয়ে মাথা নাড়ল একবার, তারপর বলল—"এইবার যাই তাহলে"—

"বাঁচি তাহলে"—বলল সীটন।

"আর যাওয়ার সময়ে তোমায় আশ্বাস দিয়ে যাই, আর দেখা করতে আসব না তোমার সঙ্গে। প্লাজা থেকে কালই চলে যাব—বিদায়! বোধ হয় একেবারেই চিরবিদায়!"

৩

রোজার সীটনের সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল মর্গানার।

এই রাত্রেই যে আরও অনেক কথা তাকে কইতে হবে অন্য একজনের সঙ্গেও, তা কি সিয়েরা-মেডার থেকে নামতে নামতে সে একবারও ভেবেছিল?

প্লাজার সুরম্য দ্বিতলের বিলাসবহুল শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সেখানে যে-পরিচারিকাকে মর্গানা দেখতে পেলো, সে ম্যানেলা।

মর্গানা আকৃষ্ট হ'ল তাকে দেখে। নিজে মর্গানা ছোট্ট মানুষটি, মানবীর চাইতে পরী বলেই তাকে মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে। কিন্তু ম্যানেলা ঠিক উলটো তার। সুন্দরী! নিঃসন্দেহে সুন্দরী! কিন্তু দীর্ঘদেহিনী বপুষ্মতী সুন্দরী! রক্তমাংসের রীতিমত প্রাচুর্য তার অঙ্গে অঙ্গে। মর্গানাকে দেখলে ভয় হয়, এই বুঝি এক্ষুণি সে হাওয়ায় উড়ে যাবে, রবিরশ্মিতে বা জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যাবে চোখের সামনেই। ম্যানেলার সৌন্দর্য কোন-কিছুতেই মিলিয়ে যাবার নয়। একান্ত স্থূল তা।

মর্গানার নৈশভোজনের সামগ্রীগুলি প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ম্যানেলা। টেবিলে সে-সব রেখে এখন লাজুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে মর্গানাকে।

মর্গানা খানিকক্ষণ দেখল তার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি। তারপর বলল—"কী দেখছ বল তো?"

"যা আর কখনো দেখিনি। এত ছোট্ট! আর এমন সাদা রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না—" বলল ম্যানেলা।

মর্গানা হেসেই আকুল—"মানুষ বলেই মনে হয় না? কী তাহলে আমি?"

মনের কথা মুখে প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ম্যানেলা।

তার ফলে কালো চোখ দু'টো আরও নিবিড় কালো হয়ে উঠছে ওর। অবশেষে খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে ও বলল—"অনেক দিন আগের কথা। আমাদের এই প্লাজার বাগানে একদিন একটা আশ্চর্য প্রজাপতি দেখা গিয়েছিল। তার ডানা সাদা, সারা দেহটাই সাদা তার। একটা লাল ফুলের উপর এসে বসল প্রজাপতিটা। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম দেখবার জন্য। মানে, অমন প্রজাপতি ত আমরা কেউ দেখিনি কখনো। সাদা হাঁসের বুকের পালক যেমন হয়, তেমনি সাদা ওর ডানা। তোমায় দেখে সেই প্রজাপতির কথাই মনে পড়ছে আমার।"

মর্গানা হাসল—"তারপর? উড়ে গেল বুঝি প্রজাপতিটা?"

"হ্যাঁ, তা বইকি! তক্ষুণি গেল। আর বলব কি আপনাকে, সেই লাল ফুলটা শুকিয়ে গেল ঘণ্টাখানিকের মধ্যে।"

"সে কী? এ যে পিলে-চমকানো কথা একেবারে!"—হাই তুলল মর্গানা—"রাতের খাবার বুঝি ওগুলি? তুমি দাঁড়াও, আমি খেয়ে নিই। প্লাজার পরিচারিকাদের মধ্যে তুমিই এক নম্বর বুঝি?"

ঘাড় নাচিয়ে ম্যানেলা বলল—"কয় নম্বর যে আমি, তা জানি নে। যে যা বলে, সাধ্যমত তাই করি, এই পর্যন্ত।"

"বেশ ভাল মাইনে?"

"আমার যতটা দরকার, ততটাই"—উদাসীন ভাবে জবাব দিল ম্যানেলা—"মুস্কিল এই যে কাজে আনন্দ পাই নে কিছু।"

"কোন কাজেই কি আনন্দ আছে?"—কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ম্যানেলার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মর্গানা।

"আছে বইকি!"—জোর দিয়ে বলে উঠল ম্যানেলা—"এমন মানুষের জন্য যদি কাজ করতে পাই, যাকে ভালবাসি, তাহলে সেকাজে আছে বই কি আনন্দ!"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে মর্গানা তাকালো ম্যানেলার দিকে। তার সে-চকিত চাউনির রং ঠিক বিদ্যুতেরই মত ধূসর নীল। "তোমার কফি তো মন্দ নয়!"—বলল সে—"তুমি নিজে করেছিলে বুঝি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানেলা, কথা আর থামতে চায় না তার। "আপনার নিজের রাঁধুনী যদি থাকত আপনার সঙ্গে, তাকে দিয়ে করিয়ে নিতাম কফি। আমরা ভাল কফি করব কেমন করে? নিজেরা যেমন খাই, অতিথিদেরও সেইরকমই দিই। আপনি অন্য দলের মানুষ—"

মর্গানা হেসে ফেলল—"তুমি যেমন সুন্দর, তেমনি আজগুবি। আমি যে কোন্ দলের মানুষ, তুমি তার কী জান?"

বুকের উপরে একটা রঙ্গীন ওড়না বাঁধা ম্যানেলার। সেইটি ধরে পাক দিতে দিতে সে বেশ সংকোচের সঙ্গে জবাব দিল—"জানি এইটুকু যে আপনি পেল্লায় ধনী, তাতে ত আর ভুল করবার যো নেই। অত সুন্দর সুন্দর পোশাক, কত কত পয়সাই না ওতে ঢেলেছেন আপনি! তার পর, আপনার ঐ গাড়ীখানা, এখানকার সব লোক তাক মেরে গিয়েছে ঐ গাড়ী দেখে। আমাদের ত মনে হয়েছে, দুনিয়ায় এমন জিনিস কিছুই নেই, যা আপনি চাইছেন অথচ পাচ্ছেন না।"

"চাইছি, অথচ পাচ্ছি না।"—ম্যানেলার কথারই পুনরাবৃত্তি করতে করতে মর্গানা পুরু করে মাখন মাখাচ্ছে এক টুকরো রুটিতে।

ম্যানেলা বলে চলেছে সেদিকে না তাকিয়ে—"মরণকুঠির ঐ লোকটার ঠিক উল্‌টো। না-চাইতেই সে পাচ্ছে যা, কোন দামই দিচ্ছে না তাকে, লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নজরের বাইরে।"

মর্গানা ধীরে ধীরে আওড়াচ্ছে তারই কথা—"না-চাইতেই পাচ্ছে যা! কী পাচ্ছে? তাছাড়া মরণকুঠিই বা কাকে বলছ তুমি? কে থাকে সেখানে? মরণকুঠিতে তো সেইসব লোকই থাকবে, যাদের চাওয়া-পাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে, যারা হাত ধুয়ে বসে আছে মরবার জন্য!"

"এ-লোকটা তা নয়"—ম্যানেলার কালো কালো ডাগর চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার কবলে পড়ে—

"এ-লোকটা তা নয়। কোন্ দেশ থেকে এসেছে, কেউ জানে না। অসুখ বিসুখ ওর কিছুই নেই, বেশ পালোয়ান বলিষ্ঠ পুরুষ। কিন্তু এদেশে এসে বাস করবার জন্য ভাড়া নিল ঐ মরণকুঠিটা, যেখানে থাকবার কথা শুধু সেই সব লোকের, ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে যারা বাইরে চলে গিয়েছে চিকিৎসার। একা থাকে, হয় বসে বসে ভাবছে, নয় ত লিখছে। আমি তাকে দুধ আর রুটি দিয়ে আসি, প্লাজা থেকে শুধু ঐ দু'টো জিনিসই সে নেয়। আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তার কাজ-কর্ম করে দেবার জন্য। কিন্তু সে পাত্তা দেয় না আমাকে।"

মর্গানার দু-চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যানেলার দিকে। সে-দৃষ্টি শুধু তীক্ষ্ণ নয়, অন্তর্ভেদীও। অদৃশ্য কোন তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি যেন। সে-দৃষ্টি দেখে অনেক সময় তার বন্ধুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, ভয় পেয়েছে অনেকে।

"ম্যানেলা, তুমি একটি লক্ষ্মী মেয়ে। এসো এদিকে, শোনো—" হাত বাড়িয়ে ম্যানেলাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এল মর্গানা।

* * *

পরদিন সকালেই মর্গানা চলে গেল প্লাজা ছেড়ে। চলে গেল ক্যালিফোর্ণিয়া ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ম্যানেলাকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ম্যানেলা যায় নি? কী ক'রে যাবে? সে যে অদৃশ্য এক লৌহশৃংখলে বাঁধা পড়ে গিয়েছে সিয়েরা মেডারের মরণকুঠির সঙ্গে!

সেই মরণকুঠির দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে সে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে। কেন যে যাচ্ছে, নিজেই তা জানে না। যাওয়ার কোন অজুহাত নেই তার। সীটন যখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে—"কেন এসেছ আবার?" কোন জবাবই সে দিতে পারবে না। তিন দিনের মত খাবার মজুদ রয়েছে সীটনের ভাঁড়ারে, ম্যানেলা ত বলতে পারবে না যে সে তা জানে না!

তিরস্কৃত হতে হবে, লাঞ্ছিত হতে হবে, তা জেনেও ম্যানেলা চলেছে। প্রবল আকর্ষণে টানছে তাকে ঐ দাড়িওয়ালা নিষ্ঠুর

লোকটা। সে-আকর্ষণ আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মর্গানার একটা কথাতে। ঐ নৃশংস দাড়িওয়ালা নাকি নিজের অজান্তেই ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন। ও নাকি, ও নাকি কী সব কঠিন কঠিন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, যার দরুণ হঠাৎ একদিন প্রাণসংশয় ঘটতে পারে ওর। তাই যদি ঘটে, একা ঐ সিয়েরা মেডারের মরণকুঠিতে, লোকালয় থেকে বহুদূরে কে ওর মরণকালে মুখে এক গণ্ডুষ জল দেবে?

সে-চিন্তা হয়ত বুঝি ক্লিষ্ট করেছিল মর্গানাকেও। তা নইলে সে অত করে ম্যানেলাকে বলে যাবে কেন—সারাক্ষণ সীটনকে চোখে চোখে রাখতে! "যে-কোন দিন, যে-কোন মুহূর্তে ও মারা পড়তে পারে। আগুন নিয়ে খেলা করছে ও, নিজেই পুড়ে মরবে সেই আগুনে"—এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছে মর্গানা।

না, মর্গানা আর গোপন করে নি কোন কিছুই। ম্যানেলাকে সব খুলে বলেছে। সে যে রাত্রি এক প্রহরের সময় বিজন গিরি-সানুতে গিয়ে দেখা করেছিল সীটনের সঙ্গে, বলেছে তা। কী কথাবার্তা হয়েছিল আপনভোলা জ্ঞানতপস্বীর সঙ্গে, তা থেকে নিজে সে কী কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে, ম্যানেলাকে যথাসম্ভব তা বোঝাবার চেষ্টাও সে করেছে। কিছুই বোঝে নি ম্যানেলা, ও সব জটিল বিষয় বুঝতে হলে যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষা থাকা একান্তই দরকার, তাও ত নেই ম্যানেলার! তাই মর্গানার অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও "বিপ্লব, বিপর্যয়" —এসব কথা মোটেই মাথায় ঢোকে নি অভাগীর। সে শুধু এইটুকু মাথায় আনতে পেরেছে যে সীটন এমন কিছু কাজ করবার জন্য সিয়েরা মেডারে এসেছে, যা করতে থাকলে যে কোন দিন সে নিজে মারা পড়তে পারে।

"তুমি যদি তাকে সত্যিই আপনজন বলে ভেবে থাক, তবে এখন থেকে তুমি ছায়ার মত ঘুরবে তার পিছনে পিছনে। তাকে জানতে না দিয়ে ঘুরবে। জানতে দাও যদি, সে হয়ত খুন করেই ফেলবে তোমাকে, তা সে পারে। একটা নেশায় ও পাগল হয়ে আছে। বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে ওর।"

দু'দণ্ডের আলাপেই মর্গানা তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এমনি বশ করে ফেলেছিল ম্যানেলাকে, সে তক্ষুণি তাকে কথা দিয়ে ফেলেছে—আজ থেকেই অলক্ষ্যে থেকে সর্বদাই সে নজর রাখবে সীটনের উপরে। সময় পেলেই সে ছুটে যাবে মরণকুঠিতে, সীটনের অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে।

তা সময় সে কমই পায়। মান্যগণ্য অতিথি প্লাজার কোন কামরায় এসে অধিষ্ঠান করলেই তার পরিচর্যার ভার পড়ে ম্যানেলার উপরে। পরিচারিকা আরও অনেক আছে হোটেলে। তাদের উপরে ন্যস্ত রয়েছে সাধারণ ভোজনাগারে পরিবেশনের ভার। সে-কাজের ধরা-বাঁধা সময় আছে। প্রাতরাশ, লাঞ্চ, ডিনার। সকালে আটটা, দুপুরে একটা, সন্ধ্যা ছয়টা। কিন্তু উপরের কামরায় অতিথি যাঁরা আসেন, তাঁদের কখন কী প্রয়োজন হবে, আগে থাকতে ত জানার উপায় নেই। তাই সদাই তটস্থ থাকতে হয় ম্যানেলাকে, কখন কোন্ ঘরে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

তাই সময় কম। নিজস্ব বলতে কোন সময়ই নেই রাত্রি এগারোটার আগে। তবে যদি জানা থাকে যে আজ কোন অতিথিই নেই কোন ঘরে, কিংবা অতিথি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন গিরিচূড়া থেকে সূর্যাস্ত বা চন্দ্রোদয়ের শোভা নিরীক্ষণের জন্য, তাহলে অবশ্য ম্যানেলা বেরুতে পারে নিশ্চিন্ত হয়ে। যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁরা ত রাত আটটার আগে ফিরছেন না!

আজও তাই হয়েছে। মর্গানা যখন সকাল বেলায় চলে গেল গাড়ী হাঁকিয়ে, তখন এমন কোন অতিথি নেই হোটেলে, যার কাছ থেকে ডাক আসতে পারে, বিশেষভাবে ম্যানেলাকেই তলব ক'রে। তারপর অবশ্য একদল পর্যটক এসেছে। তা তারা এসেই রওনা হয়ে পড়েছে সিয়েরা চাল্‌সির জলপ্রপাত দেখবার জন্য। ফিরতে সেই ঐ রাত আটটা। সুতরাং ম্যানেলার এই অবসর। সে যাত্রা করেছে মরণকুঠির দিকে। খুব সতর্কভাবে তাকে উঠতে হবে পাহাড়ে। যাতে সীটন তাকে দেখে না ফেলে।

হায় মা মেরী! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হ'ল?

একটা ঝোপের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়েছে সুঁড়ি পথটা। সেই মোড়টা ঘুরতেই ম্যানেলা যাঁর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল, সে সীটন ছাড়া অন্য কেউ নয়। কাপড়ের জুতো তার পায়ে, একটুও শব্দ পায় নি ম্যানেলা।

ম্যানেলা দিশেহারা নির্বাক্, সীটন ক্রুদ্ধ, ভর্ৎসনায় মুখর। "আজ আবার কী জন্য এসেছ, শুনি? আমার তিন দিনের খাবার মজুদ আছে, তা কি শোন নি কাল। তা ছাড়া খাবার ত হাতে নেইও তোমার! তবে কী? কী জন্য তুমি আসছ? বারবার যেখানে বলেছি—'এসো না, এসো না এসো না'?"

ম্যানেলা, সে অনায়াসে বলতে পারত, সিয়েরা মেডার কারও কেনা জায়গা নয়। সীটন যা প্লাজার ম্যানেজারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে, তা শুধু ঐ মরণকুঠির কুঁড়েখানাই, তার বাইরে কোথাও এমন এক ইঞ্চি জায়গা নেই, যেখানে ম্যানেলা বা অন্য কারও যাতায়াত সীটন ইচ্ছে করলেই নিষিদ্ধ ক'রে দিতে পারে। হ্যাঁ, পারত সে ওকথা বলতে। কিন্তু বলল না। বলবার অধিকার যে তার আছে, এই কথাটাই মনে হ'ল না তার। তার বদলে সে অতিমাত্র ব্যস্তভাবে হাতড়াতে লাগল, কী-ওজর চট করে খাড়া করা যায় তার এই নিষিদ্ধ এলেকায় প্রবেশ করার অপরাধটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য।

হ্যাঁ, একটা কথা জুটে গেল হাতের নাগালে। যেকথা প্রকাশ করতে একান্তভাবেই নিষেধ করেছিল মর্গানা, সেই কথাটাই সে ধাঁ করে বলে বসল—"মিস রয়াল একটা কথা বলে গিয়েছেন, আমি তাঁকে কথা দিয়েছি যে তুমি চাও বা না-চাও, তোমার খবরাখবর আমি রোজকার রোজ নেবই, তাই যাচ্ছিলাম আমি। কথা দিয়েছি ভদ্রলোকের মেয়েকে, কথার খেলাপ করব কেমন করে?"

"ভদ্রলোকের মেয়ে?"—খেঁকিয়ে উঠল দুর্মুখ লোকটা—"বল। বড়লোকের মেয়ে! কত বকশিস বাগিয়েছ তার কাছে শুনি? আমার খবরাখবর? কেন, আমি কি মরতে বসেছি যে রোজকার-রোজ আমার খবর তোমাকে নিতে হবে? আর মরতে বসলেও

আমি কোনদিন কাউকে অনুমতি দেব না আমার খবর নেবার। কিন্তু ঐ বড়লোকের মেয়ে ঠিক কী কী কথা বলে গিয়েছে তোমায় আমার সম্পর্কে, তা জানতে চাই আমি।"

ম্যানেলা বোকা নয়, সে সতর্ক হয়ে গেল। যা বলে বসেছে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু মর্গানা অন্য যা যা বলেছে সীটন সম্পর্কে, তা সে কক্ষণো বলবে না। উঃ, মারাত্মক সব কথা! সীটন এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করতে চাইছে, যাতে দুনিয়া উল্‌টে যেতে পারে, যা করতে গিয়ে নিজেই মারা পড়তে পারে আগে-ভাগে। সেই মারা-পড়ার মত অবস্থা যদি হয় কখনো, তখনই ম্যানেলাকে যেতে হবে তার কাছে এগিয়ে, বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে সে-বিপদ থেকে।

বলে গিয়েছে মর্গানা এই সব। আরও বলে গিয়েছে, সীটন যেন কিছুতেই টের না পায় যে ম্যানেলার ঘুর-ঘুর করার উদ্দেশ্য কী তার আশেপাশে। টের যদি পায়, ম্যানেলাকে সে মেরে তাড়াবে, সিয়েরা মেডারে দেখতে পেলে। গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে যে নিউইয়র্কের অভিজাত পরিবেশ ছেড়ে সিয়েরা মেডারের মরণকুটিতে তুলে এনেছে তার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড, সে ত মরিয়া! এবার সে নিজে পালাবে না, ব্যাঘাত করতে যে আসবে, অপসারিত করবে তাকে।

ম্যানেলা মনে রেখেছে এইসব কথা মর্গানার। সে সমস্ত ব্যাপারটাকেই হাল্‌কা করে দেখাবার চেষ্টা করল—"না, না, গুরুতর কিছু নয় তেমন। নিউইয়র্কে তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল ত ওর? তুমি ইচ্ছে করলে হয়ত বিয়েই করতে পারতে ওকে।"

এটুকু কিন্তু ম্যানেলার নিজের কল্পনা, মর্গানা এমন ইঙ্গিত কিছুই দেয় নি তাকে।

সীটনের কিন্তু অহমিকা অভ্রভেদী। সে গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল—"আমি ইচ্ছে করলে ত পারতামই ওকে বিয়ে করতে, আমি ইচ্ছে না করলেও বিয়ে আটকাত না। ও মায়াবিনী, যেটা করব বলে মনে করে, কেউ তা রুখতে পারে না। এই দেখ না! দুই হাজার

মাইল মোটর হাঁকিয়ে চলে এসেছে আমাকে পাকড়াবার জন্য। কী ক'রে জানল যে আমি এই পাহাড়ে এসে লুকিয়েছি ? নিশ্চয় গোয়েন্দা লাগিয়েছিল। কিছুই শক্ত নয় ওর পক্ষে। গোয়েন্দা লাগানো ? তুচ্ছ কথা। হাজার দুই চার ডলার যদি দিতে হয় গোয়েন্দার কমিশন, তাতে ও ভ্রূক্ষেপ করবে না। টাকার কুমীর ! বুঝেছ ? কুমীর একেবারে। অথচ গোড়ায় ওর বাবা ছিল স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ে ভেড়ার রাখাল। সেইখানেই জন্ম ঐ মর্গানার। মর্গানারও জন্ম হ'ল, মর্গানার মায়েরও মৃত্যু হ'ল। মর্গানাকে নিয়ে তার বাবা চলে এল এই মার্কিন দেশে। ঐ মর্গানারই পয়। বাবাটি এদেশে এসে ধুলোমুঠি ধরে তো সোনামুঠি হয়ে যায়। মরার আগে সে যা ডলারের পাহাড় জমিয়ে গিয়েছিল, তাতে নিউইয়র্ক থেকে সিয়েরা মেডার. এই দুই হাজার মাইল রাস্তাটা ডলার দিয়েই মুড়িয়ে দেওয়া যায়।"

"সেই সব ডলার ঐ অতটুকুন মেয়েটি পেয়েছে না কি ?"— ম্যানেলার চক্ষু চড়কগাছ একেবারে।

"পাবে না কেন ? ওর বাবার বিশ্বাস ছিল, ঐ কোটি কোটি ডলার সে যে ঘরে তুলেছে, সে শুধুই তার মেয়ের পয়ে। নিঃশর্তে সব অর্থ দিয়ে গিয়েছে ওকেই। ও তা ওড়াচ্ছে দুই হাতেই।"

"কী ভাবে ? · ফুর্তি করে ?"

"হ্যাঁ, না, তা—" বারবার ঢোক গিলতে হল সীটনকে 'ফুর্তি আর এমন কি করে ! তাতে আর কত খরচ ! কী সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা সেও নাকি করে ! লেখাপড়াটা খুবই শিখেছে কি না ! দারুণ শিখেছে ! পণ্ডিত সমাজে নাম আছে মেয়েটার। ঐটিই আবার অপছন্দ আমার। মেয়েমানুষ বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ত পুরুষের দাঁড়াবারই জায়গা থাকে না আর ! পাছে বিজ্ঞানী মেয়েকে বিয়ে ক'রে বসতেই হয় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাই আমি পালিয়ে এসেছি এদেশে। এর মধ্যে আমার বিপদের ভয়ই বা কী, আর আমার খবরাখবরই বা রোজ তোমাকে নিতে হবে কেন, আমায় বুঝিয়ে দাও ত !"

৫

অনেক ! অনেক দূর ! ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে সিসিলি !

আগে ত দূরত্বটাকে তুস্তর বলেই ভাবত লোকে, আজকাল কিন্তু আকাশে ঐ যে প্লেন, আর মাটিতে এই যে মোটর, এদের কল্যাণে দূরকে আর দূর বলে ভয় করে না মানুষে। বিশেষ ক'রে মার্কিনেরা। ওরা সব কাজেই তাড়াতাড়ি করতে অভ্যস্ত। অর্ধবিশ্ব-পরিক্রমার মত একটা বৃহৎ ব্যাপারকেও তাই তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে কোন অসুবিধা হয় নি মর্গানা রয়ালের।

জাত্যংশে মর্গানা মার্কিন নয় মূলতঃ। দেহে তার যে-রক্ত বহমান, তা স্কচ। কিন্তু তা হলে হবে কী! আশৈশব মার্কিন মুলুকেই মানুষ ত সে! আগাগোড়াই সে তুরন্ত রকম তাড়াতাড়ি করেছে এবারকার এই ভ্রমণের ব্যাপারে। প্যারিতে যাত্রাবিরতি করেছিল মাত্রই সাতদিন, রোমে মাত্র তুই রাত্রি। অবশেষে এই সে পৌঁছে গেল সিসিলের একটি বিশেষ জনবিরল অংশে। এমন তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল, যেন স্থলে জলে ব্যোমপথে তাকে উড়িয়ে এনেছে কোন অনৈসর্গিক শক্তি।

মর্গানা বসে আছে একটা উত্থানে, সে যেন স্বর্গেরই একটা টুকরো। বসে বসে নিদ্রালু নয়নে তাকাচ্ছে রৌদ্রদীপ্ত নীল জলের দিকে দিগন্ত-বিসারী ভূমধ্যসাগরের। হ্যাঁ, নয়ন আজ নিদ্রালু তার, যে-নয়নের দৃষ্টিতে নিউইয়র্কবাসীরা এতাবৎকাল শুধু বিত্যুতের স্ফুরণই দেখেছে।

উত্থানটা একটা প্রাসাদেরই উত্থান, যদিও উত্থান আর প্রাসাদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় সিকি মাইলের। বাড়ীটাকে দেখা যাচ্ছে পাইনবনের মাথার উপর দিয়ে, শাখাবহুল গুলিয়াণ্ডার তরুর ফাঁকে ফাঁকে। বাড়ীটা বহু যুগ আগেকার। ভেঙেই পড়েছিল প্রায়। হঠাৎ, পর্যটনে বেরিয়ে মর্গান দেখতে পায় সেই ভগ্ন প্রাসাদকে। প্রাচীন গ্রীক রীতির স্থাপত্য, গোলাপী মর্মরে আগাগোড়া তৈরী, অপূর্ব! দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কিনে নেওয়া, কেনার সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্গঠন শুরু। সে-পুনর্গঠন এখনও ঠিক শেষ হয় নি। উপরতলার ছাদ-

আঁটা বারান্দায়, আর সমুদ্রমুখী সমুখের দেয়ালে অলঙ্করণ এখনও কিছু কিছু রয়েছে বাকী, একদল মিস্ত্রি সেখানে কাজ করেই যাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। মর্গানার চোখ সমুদ্রের দিক থেকে ঘুরে ঘুরে এক একবার এসে তাদের দিকে নিবদ্ধ হচ্ছে যখন, তখন স্পষ্টতঃই বিরক্তি ফুটে উঠছে সে-দৃষ্টিতে। এত দেরি? এত দেরি? তাড়াতাড়ি কাজই যে মর্গানার পছন্দ, তা তো ওদের জানা উচিত!

এই রকম একবার তাকাতে গিয়েই মুখে হাসি ফুটে উঠল মর্গানার। আসছে কেউ একজন। একহারা, শ্যাওলা-রং, প্রিয়দর্শন এক যুবক। নিকটে এসেই সে মাথা থেকে টুপি তুলল, অভিবাদন করল বিপুল সম্মানে। আর মর্গানা যখন হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, সে-হাতে চুম্বন করল বিগলিত শ্রদ্ধায়।

"স্বাগত! হাজার বার স্বাগত মাদামা!"—বলছে যুবক। ইংরাজীতেই কথা কইছে সে, তাতে বিদেশী টান একটু যদি থেকেও থাকে, তা অতি সামান্য। "আপনি এসেছেন, তা রাত্রেই শুনেছিলাম, কিন্তু কেমন যেন সাহস হচ্ছিল না বিশ্বাস করতে যে খবরটা সত্যি। রাস্তায় বোধ হয় থামেন নি কোথাও!"

—"কী করে আর থামি?" —বলল মর্গানা—"সারা পৃথিবীর গতি এমনিতেই এত মন্থর যে ব্যক্তিগতভাবে আয়েসী চালে চলাফেরা আর পোষায় না আমার।"

যুবক উত্তর দিল অল্প একটু হেসে—"পৃথিবীর গতি নিয়ে নালিশ যদি করতে হয়, সে ত ভগবানের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও করা চলবে না! তা, আপনি যদি করেনই সে-নালিশ, তাহলে এই ক্ষুদ্র গ্রহটার গতিবেগ তিনি দিতেও পারেন বাড়িয়ে। আপনাকে অদেয় তাঁর যে কিছু আছে, একথা ত বিশ্বাস করাই শক্ত।"

মর্গানা একটু হাসল যেন। কিন্তু এ-স্তাবকতার জবাব কিছু দিল না। আর তা সে দিল না দেখে যুবক নিজেই বলে চলল—"আমার কিন্তু মনে হয়—কী মনে হয় জানেন! পৃথিবীর গতির কথা বলছি না, বলছি সময়ের গতির কথা—সময় যেন উড়ে চলে যায়। বাড়ীর

কাজটা শেষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি, আমরা সকলেই করেছি চেষ্টা, কিন্তু এখনও দেখুন, অনেক কাজই বাকী।"

মর্গানা বাধা দিল তার আত্মগ্লানির উচ্ছ্বাসে—"না, তা কেন। ভিতরের কাজ ত সম্পূর্ণই! নিখুঁত একেবারে। আমি যা চেয়েছিলাম, ঠিক সেই জিনিসই হয়েছে। এত সুন্দর যে দাঁড়াবে আমার পরিকল্পনা, মিস্ত্রির হাত দিয়ে এমন চমৎকার উৎরে যাবে, তা আমি আশাই করতে পারিনি। পুরীটা এখন পরীদেরই যোগ্য বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অকবিও কবি হয়ে যাবে এখানে এসে বাস করলে।"

যুবকটি এক সুপ্রাচীন ইতালীয় অভিজাত বংশের শেষ জীবিত পুরুষ, মার্কেস (মার্কুইস) গিউলিও রিভার্ডি। জুলিয়াস সীজারের সময় থেকেই এ-বংশ সম্ভ্রান্ত জমিদার। কিন্তু সম্ভ্রমটুকু এখন শুধু নামের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, জমিদারি আর নেই। মর্গানা এই যে প্রাসাদটি নতুন ক'রে গ'ড়ে নিয়েছে, প্রায় এইরকমই সুন্দর আর একটা প্রাসাদ এই রিভার্ডিরও আছে, এখান থেকে অল্প দূরেই। তবে সেটিরও ভগ্নদশা, এবং সেটিকে নতুন ক'রে গ'ড়ে নেবার ক্ষমতা রিভার্ডির নেই।

মর্গানা যখন এ-বাড়ী কিনল, তার পরিচয় হল স্থানীয় যাজক ফাদার এ্যালোসিয়াস-এর সঙ্গে। তিনিই রিভার্ডিকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন মর্গানার সঙ্গে। রিভার্ডি নিঃস্ব হলেও তুচ্ছ নয়। অন্ততঃ মর্গানা তাকে উপেক্ষা করে নি। তার উপরেই সে ভার দিল ভাঙ্গা বাড়ীটা নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবার। দরাজ হাতে পারিশ্রমিক সে দেবে রিভার্ডিকে। রিভার্ডি বেঁচে গেল। এই অর্থটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার।

সত্যিই প্রাণপণে সে খেটেছে।

হঠাৎ পূর্ণ দৃষ্টিতে মার্কেসের দিকে তাকিয়ে মর্গানা বলল—"কিন্তু আমার অন্য প্রাসাদের খবর কী? ডানাওয়ালা প্রাসাদের? রূপোলি ঈগল-এর?"

"স্বাগত! হাজারবার স্বাগত মাদামা!" । পৃঃ ৩১

লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে বুকের ভিতরটা হাওয়ায় ভ'রে নিল রিভার্ডি—"আ-হা! সে তো পরমাশ্চর্য সৃষ্টি! আমরা ভেবেছিলাম, ও-পরিকল্পনাটি আপনার কোনমতেই বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। কিন্তু তা-তো নয়! আপনার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি আমরা, তার ফলে—উঃ, নারীর মস্তিষ্ক থেকে যে এমন বিস্ময়কর, যুগান্তকারী বিমানের উদ্ভব হতে পারে, কে তা ভেবেছিল?"

হতভাগ্য রিভার্ডি! প্রশংসা করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেল সে। হঠাৎই মর্গানা খেঁকিয়ে উঠল একেবারে—"থামুন তো! স্বার্থপর পুরুষদের ঐ মামুলি প্যাঁক-প্যাঁক আর শোনাবেন না আমাকে! 'নারীর মস্তিষ্ক থেকে!' নারীর মস্তিষ্ক যে বৃহৎ বা মহৎ কিছুর কল্পনা করতে পারেই না, একথা কবে প্রমাণ হয়েছিল? কী ভাবে? পুরুষ জাতটাই অকৃতজ্ঞ। তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সব-কিছুর জন্যই সে নারীর উপরে নির্ভর করেছে চিরদিন, আবার চিরদিনই নারীকে রেখেছে ক্রীতদাসী, হেলাফেলার সামগ্রী করে। সে-পাশা আমরা উলটে দিচ্ছি এবার!"

মর্গানার চোখে তখন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তার কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে ক্রুদ্ধ তর্জন, হাতের আঙুলগুলি মুঠি পাকিয়ে শক্ত হয়ে উঠছে।

রিভার্ডি প্রমাদ গণনা করছে। একটা বেফাঁস কথায় অন্নদাত্রী এমনধারা ক্ষেপে যাবে তার উপরে, সে তা ভাবতে পারে নি। ভয়ে ভয়ে সে বলছে—"মাফ করুন। আমি বুঝতে পারি নি—"

এক সেকেণ্ডের মধ্যে মেজাজ পালটে গেল মর্গানার। সে হেসে বলল—"তা তো নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন নি। আর বিস্ময়কর, যুগান্তকারী, এসব বিশেষণ যা যা আপনি প্রয়োগ করছিলেন আমার রূপোলি ঈগল সম্পর্কে, ওর কোনটিই অতিশয়োক্তি নয়! বিমানখানা বিস্ময়করও বটে, যুগান্তকারীও বটে। নারীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই যে বিস্ময়কর বা যুগান্তকারী, তাও নয়। ওটা যদি নারীর বদলে কোন পুরুষের মাথা থেকেও বেরুতো, তা হলেও ঐ সব বিশেষণ বেমানান হত না ওর পক্ষে।"

একটু থামল মর্গানা, বোধ হয় এইটিই দেখবার জন্য যে রিভার্ডি বলে কিনা কিছু। তা সে বলল না দেখে নিজেই আবার যোগ করে দিল পূর্বকথার সঙ্গে—"অবশ্য তখন আর ওকথা উল্লেখ করতে না তুমি।"

আবার হেসে উঠল মর্গানা। এবার এটা সত্যিকার খোশ-মেজাজের হাসি। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"কাজের কথায় এসো এবার, রূপোলি ঈগল্-এর চলাফেরা কেমন? গতিবেগই বা কত?"

মার্কেস গলার স্বর নামিয়ে ফেলল একেবারে—"আশ্চর্য! হতবাক করে দেবার মত একেবারে! বলতে ভয় হয়, সে যেন অনৈসর্গিক কাণ্ড একটা। আপনার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম আমরা। দেখলাম নিষ্প্রাণ জিনিসটার আচরণ ঠিক যেন প্রাণবন্তের মতন।"

"কেমন?"—ছোট্ট একটু প্রশ্ন মর্গানার।

"সেই যে তরল পদার্থটা দিয়ে গিয়েছিলেন আপনি, তাই দিয়েই করলাম পরীক্ষা। গোপনেই ঢেলেছিলাম তেলটা ফোকরের ভিতর। কারিগরেরা দেখে নি ঢালতে। কাজেই রূপোলি ঈগল যখন আকাশে উড়ল, তারা ভয় পেয়ে গেল রীতিমত। ভূতুড়ে কাণ্ড, ভাবল তারা।"

"খুব সাহসী বলতে হবে তাদের!"—হাসল মর্গানা—"তা তুমি একাই উড়লে আকাশে?"

"একাই। হাল ধরে বসে থাকা কষ্টের কিছু নয়। যেমন ঘোরাচ্ছি, ঠিক তেমনি ঘুরছে। সমুদ্রে যেন হাল্কা প্রমোদতরণী একখানা। অনুকূল হাওয়ায়, স্রোতের মুখে নেচে নেচে ছুটেছে। আমি তো নিজে বৈমানিক। কোন বিমানকে আমি এত বেগে ছুটতে দেখি নি, দেখি নি এত উপর-আকাশে উঠতেও।"

"কাল তাহলে আমরা খানিকটা ঘুরে আসব রূপোলি ঈগলের পিঠে চড়ে।"—বলল মর্গানা—"কোথায় যাওয়া যেতে পারে, সেটা তুমিই ঠিক কর। গতি অবাধ রূপোলি ঈগলের, পৃথিবীর মাটিতে বা

উপর-আকাশের বায়ুস্তরে এমন কিছু নেই, যা আমাদের গতিরোধ করবে বা আমাদের ধ্বংস করতে পারবে। আমার কথায় পুরো বিশ্বাস রাখতে পার মার্কেস !"

এত নিশ্চিত? রিভার্ডির দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠল, তা একনিষ্ঠ ভক্তেরই গভীর প্রত্যয় বটে, কিন্তু মর্গানা ঠিকই ধরে ফেলল, তার সে-প্রত্যয়ে অল্প একটুখানি খাদও আছে সংশয়ের আর আশঙ্কার। খুব মিষ্টি করে রিভার্ডি মৃদু একটু দ্বিধা প্রকাশ করল—"অবশ্য স্বীকার করতেই হবে—কোথাও কোন পুরুষ বিজ্ঞানী এযাবৎ যা আবিষ্কার করতে পারে নি, আপনি তা করেছেন। কিন্তু তাতে যে কোথাও কোন ত্রুটি নেই, তা এক্ষুণি আপনি বলেন কী করে? চালাতে চালাতে, নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল দেখতে দেখতে তবে তো বুঝতে পারা যাবে যে—"

রিভার্ডির কথা শেষ হতে দিল না মর্গানা—"পুরুষ বিজ্ঞানী? ওদের গতি মন্থর। কাজের চাইতে কথা অনেক বেশী ওদের। বছরের পরে বছর ওরা আলোচনাতেই কাটিয়ে দেয়। তার পরেও, ওদের মধ্যে একজন যখন সত্যি সত্যিই আবিষ্কার করল কিছু একটা, অন্য সবাই লেগে গেল তার ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বার করতে। সে-আবিষ্কারটা সার্থক হল, না অসার্থক, তা প্রমাণ হতেই কেটে গেল পুরো যুগ একটা। আমি বাবা পুরুষ নই, বহু ভাগ্য আমার। সামান্যা নারী, কারও মতামতের ধার ধারি না। কোন দেশের কোন গবর্নমেণ্টেরও মুখাপেক্ষা করি না কোন ব্যাপারেই। সাফল্য-অসাফল্যের উপরে নিজের জীবন-মরণই বাজি রাখি তিলমাত্র দ্বিধা না করে।

রিভার্ডি সায় দিচ্ছে মর্গানার সব কথাতেই, কিন্তু সব শোনার পরে প্রশ্নও একটা না করে পারল না—"গবর্নমেণ্টের ধার ধারেন না, তা ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন গবর্নমেণ্টের হাতেই তো নিশ্চয় তুলে দেবেন এই নব আবিষ্কার? জিনিসটার কথা প্রচার হয়ে পড়া-মাত্রই তো সব দেশের সব গবর্নমেণ্ট এসে ধর্না দেবে আপনার দোরে।

কাকে ফেলে কাকে দেবেন ? আপনার জন্মভূমি হল গ্রেটবৃটেন, বাসভূমি হল মার্কিন দেশ, তারপর আবিষ্কারের কারখানা হল ইতালিতে, দাবি তো প্রত্যেকেরই আছে !”

“দাবি প্রত্যেকেই করবে, কিন্তু আমি দেব না কাউকেই। কেন দেব ? আবিষ্কারকদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে গবর্ণমেণ্টগুলি, তা আমি নিজের চোখেই দেখছি না ? একটা ছায়াছবির ভাঁড়কে ওরা লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে দেবে, কিন্তু মহৎ একজন বিজ্ঞানী বা প্রাতঃস্মরণীয় একজন চিন্তানায়ক যদি রুটির অভাবে শুকিয়ে মরে যান, তাঁর দিকে ফিরেও চাইবে না। না, না, গবর্ণমেণ্টরা নিজেদের আঁধার কক্ষপথে ঘুরপাক খেতে থাকুক, ওদের সমুখে আলো ধরবার দায় আমার নয়।”

এখানে একটা ফুল, ওখানে আর একটা ফুল তুলতে তুলতে মর্গানা এগিয়ে চলেছে। সাথে চলেছে রিভার্ডি। অবশেষে সে তার মনের কথাটা বলে ফেলল সাহস করে—“এখানকার এই যে কারিগরেরা, এদের অসীম কৌতূহল রূপোলি ঈগল সম্পর্কে। ওরা নিজেদের মধ্যে কত কীই যে জল্পনা করে ওর সম্বন্ধে, তা আর কী বলব আপনাকে। ক্রমে এসব জল্পনা বাইরের লোকের কানেও আসবে, ধরুন যেসব ক্লাবে বা সম্মেলনে ওরা যাতায়াত করে, সে সব জায়গায় কারও জানতে বাকী থাকবে না যে একটা অদ্ভুত বিমান তৈরী হয়েছে এখানে, যার কলকব্জা সম্বন্ধে ওরা একেবারেই অজ্ঞ। ধরুন আজ পনেরো মাস ধরে ওরা কাজ করছে এখানে, অথচ কী কাজ করছে, তা জানে না। মনে মনে একটা অসন্তোষ যে ধোঁয়াচ্ছে না ওদের, তা কি বলা যায় জোর করে ?”

“তারা মাইনে তো পাচ্ছে, না কি ? পাচ্ছে তারাও, পাচ্ছ তুমিও !”

রিভার্ডির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসল মর্গানা খানিকটা—“অসন্তোষ যদি তবু তাদের হয়, কী করবে করুক। বিমানের কাঠামোই তারা গড়েছে, ওর প্রাণশক্তি আমার কাছে। যাতে ও আকাশে উড়বে, সে-জিনিস আমি না দিলে বিশ্বজগতে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। জল্পনা করে, অসন্তুষ্ট হয়ে ওরা করবে কী ? আমার বা রূপোলি ঈগলের ?”

হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রায় দুই মিনিট কাল নীরব রইল মর্গানা। তারপর আবার বলতে শুরু করল—"শোন মার্কেস, আমি তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিই। আমার উপরে অটুট বিশ্বাস তোমার। বিশ্বাস না থাকলে আমার কথায় নির্ভর করে নিছক একা তুমি আকাশে উড়তে পারতে না রূপোলি ঈগলকে নিয়ে। নিজের জীবন তুমি বিপন্ন করেছিলে আমার কার্যসিদ্ধির জন্য, এ আমি ভুলব না।"

"চিরদিনই করব বিপন্ন"—বলল রিভার্ডি।

এদিকে মর্গানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে কথা কইতে কইতে—"তার দরুণ পুরস্কারও পাবে যথেষ্ট। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক যদি, কত কী যে দেখতে পাবে ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম কোণে কোণে, তা তো এই মুহূর্তে কল্পনাও করা যায় না এখানে বসে! কল্পনা করা যায় না যে বহু আলোকবর্ষের দূরত্বে কোথায় আছে কোন্ ছায়াপথে কোন্ অজানা পৃথিবী। কে জানে, সেখানে জীবনধারা কী রকম। হয়ত আমাদের চাইতেও উন্নততর কোন সুসভ্য জীবের বাস সেখানে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে নতুনতরো এক অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার হয়ত খুলে যাবে আমাদের সমুখে—"

হঠাৎ তার উৎসাহের আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল রিভার্ডি—"তাতে লাভ কী হবে আমাদের?"

মর্গানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। রিভার্ডির কথা সে ঠিক ঠিক শুনেছে তো? নিজের অজান্তেই সে শুধু আওড়ালো একবার—"লাভ?"

"হ্যাঁ, তাতে লাভ কী হবে, জীবনে যদি আমরা কেউ ভালবাসার সন্ধান না পাই?"

একটুখানি চুপ করে থেকে মর্গানা মাথা তুলে সুস্পষ্ট স্বরে বলল—"ভালবাসা বলে কোন বস্তু নেই পৃথিবীতে।" এ কী সীটনের কথার প্রতিধ্বনি?

৫

পৃথিবীতে সুন্দরতম দৃশ্য কী ?

এ-প্রশ্ন করলে অনেক লোকের কাছ থেকেই জবাব পাওয়া যাবে সিসিলির সূর্যাস্ত। আকাশ তখন রংয়ে রংয়ে ঝলমল করে, আর সেই সাত-রঙা আকাশের প্রত্যেকটা রং প্রতিফলিত হয় নীচের সমুদ্রে। কখনো পাশাপাশি, কখনো মিলেমিশে। সেই আসন্ন সন্ধ্যায় হাওয়া থাকে মন্থর মদির, মানুষের কর্মব্যস্ততাকে তখন মনে হয় অনাবশ্যক, এমন-কি বেতালাও।

মর্গানা জীবনে কখনো স্থৈর্যের স্বাদ পায় নি। শান্তি যে কী পবিত্র, মধুর লাগতে পারে, হঠাৎই যেন আজ তা উপলব্ধি করল। গোলাপী-মর্মরের কক্ষপ্রাচীর পিঠের দিকে রেখে সে তার উপরতলার খোলা বারান্দায় বসে আছে সান্ধ্যভোজনের ঠিক পরে। আকাশের আলো সমুদ্রের জলে কী আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে, স্থির লক্ষ্য দেখছে শুধু তাই।

সারা অপরাহ্ন সে কাটিয়ে দিয়েছে গোটা বাড়ীটাতে আর তার সংলগ্ন বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে। "সুন্দর হয়েছে, সুন্দর হয়েছে", বারবার বলেছে মার্কেস গিউলিও রিভার্ডিকে। সে-বেচারী মার্কেস পড়েছে এক মহা সমস্যায়। এই বিদেশিনী মনিবনীকে সে কোনমতেই বুঝতে পারছে না। এমন রাশি রাশি অর্থ, পর্বতপ্রমাণ অর্থ, এই বাড়ীটার পিছনে খরচ করার কী প্রয়োজন ছিল এই মহিলার ? যখন এমন কোন আপনজন ত্রিসংসারে তাঁর কেউ নেই, যাকে নিয়ে তিনি এখানে বাস করতে পারেন ?

তার উপরেও অন্য একটা কারণে মহিলাটি গিউলিওর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছেন দুর্বোধ্য এক প্রহেলিকা। অত্যন্ত উঁচু স্তরের প্রতিভার উনি অধিকারিণী। নারীর ভিতরে যা সচরাচর কেউ প্রত্যাশা করে না,

সেই বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, সেই প্রতিভা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এক পরমাশ্চর্য বিমানের, বিনা ইঞ্জিনে তা আকাশে ওড়ে। ওড়াবার শক্তি তাতে সঞ্চারিত হয় যে-একটা তরল পদার্থ থেকে, তার নাম-গোত্র কেউ জানে না, তা একান্তভাবে এই মহিলাটিরই নিজস্ব আবিষ্কার।

ডিনারে আরও কয়েকটি লোক উপস্থিত ছিলেন, এই প্যালাজো-ড্য-অরোর (রজত প্রাসাদের) নিকটতম প্রতিবেশী যাঁরা। খাওয়ার পরে এখন, যার যেখানে রুচি বসে আরাম করছেন, কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে। দুই একজন আছেন এঁদের মধ্যে, গোড়ায় ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন যাঁরা, কিন্তু পরবর্তীকালে সিসিলিকেই বেছে নিয়েছেন বাসস্থান হিসেবে। অন্য অতিথিরা অবশ্য মার্কিন পর্যটক।

ইংরেজদের মধ্যে অন্যতম, এক বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁর সিসিলিবাসের কারণই হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর ভগ্ন স্বাস্থ্য, মর্গানাকে সম্বোধন করে বললেন—"বেশ ভাল লাগছে তো মিস রয়াল, আপনার এই নতুন জায়গাটি! আমার তো মনে হয়, সারা দুনিয়া ঢুঁড়লেও এমন জায়গা আর একটি পাবেন না। এখন এ-বাড়ীতে আপনার অভাব রইল শুধু একটি জিনিসের।"

"একটি জিনিস? কী জিনিস?"—জিজ্ঞাসা করল মর্গানা।

"একটি স্বামী"—

মর্গানা হাসল—"সেই মামুলি লেজুড়। একান্ত অনাবশ্যক, আমার তো মনে হয়। অনাবশ্যক, এবং অশেষ অশান্তির আকর। জানেন? মার্কেস রিভার্ডি আজই আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন—আপনজন না থাকলে এমন সুন্দর প্যালাজো তৈরি করে আমার লাভ কী হল?"

এক মার্কিন পর্যটক সায় দিলেন—"পরীর দেশের বাড়ী আর বাগানও একা-মানুষের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।"

"একার পক্ষে অস্বস্তিকর, কিন্তু দু'জনের পক্ষে বিরক্তিকর"—হেসে উঠল মর্গানা—"ও মশাই কর্নেল বয়েড, বিয়ে জিনিসটা সব লোকের ধাতুতে খাপ খায় না। তা আমি একা যদি বিয়ের বাজারের বাইরে থেকে যাই, বিশ্বসংসারের ক্ষতি হবে না কিছুই। ও-বাজারে বিক্রি

হবার জন্য প্রায় সারা মানুষ জাতটাই এক পায়ে খাড়া আছে। আমায় আপনারা হিসাবের বাইরে রেখে দিলেই ভাল করবেন।"

কর্নেল বয়েড হেসেই আকুল—"চিরদিন এমন মতিগতি থাকবে না আপনার। এমন মধুর স্বভাব যার, তার হৃদয় নেই, এও কি হয়?"

বয়েডের স্ত্রী চিররুগ্না। চিঁ চিঁ করে সায় দিলেন স্বামীর কথায়—"নিশ্চয়! নিশ্চয়! হৃদয় না থাকলে চলে কখনো?"

মর্গানা গড়াচ্ছিল আরামকেদারার গদিতে। উঁচু হয়ে বসল এইবার। চারদিকের মুখ কয়েকখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, বেশ যেন 'যুদ্ধং দেহি' মেজাজে। তারপর বলল—"হৃদয় হল একটা মাংসপেশী। ওটা জীবনধারণের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। ওটা সকলেরই থাকে, আছে আমারও। তা নিয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু আপনারা যাকে 'হৃদয়' বলছেন, সেটা সে-হৃদয় থেকে আলাদা জিনিস, সেটা বস্তুতঃ মস্তিষ্কেরই ছদ্মনাম একটা। সেই মস্তিষ্কেরই এক বিশেষ ধরণের কাজ হল মানুষের অন্তরে একটা আবেগ সৃষ্টি করা, কোন বিশেষ মানব বা মানবীর সাহচর্যের জন্য। সেই আবেগের বশেই বিবাহ করে মানুষে।"

কর্নেল বয়েড তখনো হাসছেন—"আবেগটা ভাল। ওরই দৌলতে মানবজাতিটা বেঁচে আছে।"

"বেঁচে থেকে উপকার করছে কার, সেইটেই আমি বুঝতে পারিনে"—বলল মর্গানা—"আমার তো মনে হয়, এ-সৃষ্টি বাতিল হয়ে যাওয়া দরকার। দরকার নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হওয়া।"

বাগানের পথে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল। রোমক ধর্মমণ্ডলের পাদরির পোষাক-পরা এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন দোতলার বারান্দায়। মার্কেস বলে উঠল—"ডন এ্যালোয়াসিস"—যে যেখানে ছিল, উঠে দাঁড়ালো যাজককে অভ্যর্থনা করবার জন্য, মর্গানা তাঁকে অভিবাদন করল বিশেষ সম্মানের সঙ্গে। ডন তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, কোমলস্বরে

বললেন—"স্বপ্ন সার্থক, কী বল? হাওয়ার বুদ্বুদের মত ফেটে যায় নি সে-স্বপ্ন। এখনও ভাসছে, এখনও ঝলসাচ্ছে।"

কথা কইতে কইতে মাথা নেড়ে নেড়ে উপস্থিত সকলকেই নমস্কার জানালেন পাদরি। তারপরে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, অস্তমিত সূর্যের রক্তরশ্মিতে রঙ্গীন সমুদ্রের শোভা। তাকিয়ে দেখবার মত চেহারা ভদ্রলোকের। দীর্ঘদেহ, মুখে প্রশান্তি আর প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট আভাস। সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যখন তিনি গৃহস্বামিনীর দিকে তাকালেন, তখন তাঁর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

স্বপ্ন সার্থক কিনা, তাই ছিল পাদরির প্রশ্ন। সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিল মর্গানা—"সবই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। হয়েছে বা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা কাজ শেষ করতে পারে নি এখনো।"

"কাজ কখনো শেষ হয় নাকি?"—পাদরি বললেন শান্তস্বরে—"কিন্তু কাজের কথা থাকুক. তুমি সুখে আছ তো?"

মর্গানার মুখখানি ঝলমল করে উঠল একবার, তারপর সে-দীপ্তি নিবেও গেল আবার মুখ থেকে। চাপা গলায় সে উত্তর দিল—"মনে তো হয় তাই। সুখে থাকাই তো উচিত আমার।"

মার্কেস রিভার্ডি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছেন, পাদরি এইবার বসলেন তাইতে। অটুট গাম্ভীর্যের মধ্যেও এমন মধুর তাঁর আচরণ। বারান্দায় সমবেত অতিথিরা সবাই মুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

পাদরি আসন গ্রহণ করার পরে মর্গানাও বসল—"সুখে থাকাই তো উচিত আমার। অন্ততঃ যথাসময়ে হবই সুখী।"

কর্নেল বয়েড মাঝখান থেকে বলে উঠলেন—"আমি এই তরুণী মহিলাকে বলছিলাম, ফাদার, এই মনোরম প্যালাজোও (প্রাসাদ) তাঁর কাছে ফাঁকা লাগবে অচিরেই, যদি এখানকার সুখ-শান্তির অংশ নেবার জন্য তিনি দ্বিতীয় কাউকে না ডাকেন।"

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে এনে ডন এ্যালোসিয়াস বললেন—

"ভদ্রমহিলার নিজের চিন্তাধারা কী রকম এ-বিষয়ে, সেটা না জেনে তো কিছুই বলা চলে না এ-বিষয়ে!"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মর্গানা—"আমি ও-বিষয়ে কোন চিন্তাই করি না ফাদার! বাড়ী ফাঁকা? বন্ধু-বান্ধবী কি নেই আমার? সারা ইউরোপের লোক সিসিলিতে এসে ভিড় করে শীতকালে। তাদের কয়েক ডজনকে তো অনায়াসেই এই বাড়ীতে এনে ফেলতে পারি আমি।"

মার্কেস এই সুযোগে টিপ্পনি কাটল একটা—"সেরকম বন্ধু বা বান্ধবীরা আপনার সুখের দিকে চাইবে কি?"

মর্গানা হেসে ফেলল—"তা কখনো চায়? আমি অতখানি প্রত্যাশা করিনে তাদের কাছে। তাদের কেন, কারও কাছেই না। এযুগে নিজের ছাড়া অন্য কারও সুখের কথা কেউই ভাবে না। না, বন্ধুদের কাছে তেমন কোন প্রত্যাশাই আমার নেই। তা ছাড়াও কথা আছে ফাদার। আমি ব্যস্ত মানুষ, বন্ধুবান্ধব ডেকে এনে মজলিশ করার সময়ই হবে না আমার। নানা রকম গবেষণায় ডুবে আছি আমি। ওলনদড়ি দিয়ে মাপা যায় যতটুকু গভীরতা, তার চেয়ে অনেক বেশী গভীরে আমি ডুব দিয়ে দেখতে চাই।"

"গভীরতম গভীরে যদি নামতে পার, সেখানেই পাবে ভগবানকে", ধীরে ধীরে মন্তব্য করলেন এ্যালোসিয়াস। হাল্কা কথা হঠাৎই একটা গাম্ভীর্যভরা তত্ত্বকথা হয়ে দাঁড়াল। পাদরি বলেই যাচ্ছেন—"অবশ্য গভীরতম গভীরেও তিনি আছেন বলে এখানেও যে তিনি নেই, তা নয়। তাঁকে পেতে হলে গভীরেই যে নামতে হবে, এমন কোন কথা নেই। নিশ্বাসবায়ুর মতই তিনি সহজ আমাদের পক্ষে, সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, অন্তরঙ্গ।"

একটা নিশ্বাস ফেললেন পাদরি, পরিতাপের নিশ্বাস এটা, "এই সব গবেষক আবিষ্কারকের জন্য দুঃখ হয় আমার। গবেষণার শেষ সীমায় কেউ পৌঁছোতে পারে না। অথচ গবেষণার পথে হাঁটতে হাঁটতে, পথের পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন দুই বাহু মেলে, বুকে তুলে নেবার জন্য, তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যায় অবহেলায়।"

মর্গানা মৃদু, বিনীত স্বরে বলল—"শ্রদ্ধেয় ডন, আপনি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের উপরে আপনার অবিশ্বাস তো স্বাভাবিকই। ধর্মমতের পরিপন্থী তো! বৈজ্ঞানিক অনেক তথ্যই তত্ত্বকথার পরিপন্থী।"

হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করলেন এ্যালোসিয়াস—"কী করে পরিপন্থী হবে বৎসে? সব বিজ্ঞানের উৎস তো তিনিই! পৃথিবীর সব-সেরা গণিতজ্ঞ যিনি, তিনিও সৃষ্টিকর্তা নন গণিতের। বিধিনির্দিষ্ট, শাশ্বত একটা তথ্যের তিনি প্রচার করেছেন শুধু।"

রিভার্ডি বলল—"তাতে আর সন্দেহ কী? তবে সেনোরা রয়াল যা বলতে চাইছেন, তা বোধ হয় এই যে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদের বিরোধী।"

শান্তভাবেই এ্যালোসিয়াস উত্তর দিলেন—"কই, আমার অভিজ্ঞতা তো তা বলে না। আধুনিক ঐ যে বেতারবার্তা, ও তো যুগ যুগ ধরে আমাদের সুবিদিত। সমবেত প্রার্থনার পরে যখন ঘণ্টা বাজাই আমরা গির্জায়, স্যাংটাস (পবিত্র) ঘণ্টাধ্বনি যাকে বলা হয় সচরাচর, তখন তো (বিশ্বাসের কথা বলছি), ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছে যে উপাসকের হৃদয়, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিজের আত্মার প্রত্যক্ষ একটি যোগাযোগ, বার্তাবিনিময়েরই অনুভূতি লাভ করে থাকেন। অন্ততঃ এই রকমই বিশ্বাস আমাদের। তথ্যটা ধর্মশাস্ত্রের অজ্ঞাত হত যদি, এ-বিশ্বাস আমাদের আসত কোথা থেকে? না, বিজ্ঞানের ভিতর ধর্মমতবিরোধী কিছু দেখতে পাইনে আমি। কিছু বিজ্ঞানীকে অবশ্য স্বয়ংবিরোধী ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। সেই তাঁরা, ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেও যাঁরা তাঁর (অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন প্রকৃতির বিভূতির) সন্ধান করে বেড়ান যন্ত্রপাতির সাহায্যে।"

বেশ কিছুকাল গোটা বারান্দায় সবাই নিস্তব্ধ। পাদরির মিষ্ট অথচ যুক্তিপূর্ণ ভাষণে সবাই মন্ত্রমুগ্ধেরই মত। কোথায় একটা ঘণ্টা বাজতে লাগল কোন্ সুদূর ধর্মমঠে, প্রার্থনার জন্য সুমিষ্ট আহ্বান সর্বসাধারণের উদ্দেশে। আকাশ আঁধারে ঢেকে আসছে, তবু সেই

আঁধারের বুকে বুকে এখানে ওখানে প্রকাশ পাচ্ছে এক একটা তারার ফুটকি। মর্গানা বলছে—"এই রকম পরিবেশেই যদি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেতো! সূর্যাস্তের আঁধারি-আলো, ফুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত হাওয়া, স্বর্গে উঠে যায় পৃথিবী, পৃথিবীর বুকেই নেমে আসে স্বর্গ! মানুষের পক্ষে তখন সৎ হওয়া শক্ত হত না, সুখী হওয়াটা হত স্বাভাবিক। কিন্তু তবু 'কিন্তু' থেকে যায় কোথায় যেন। তেমনধারা অস্তিত্ব ঠিক 'জীবন' হত না, জীবন বলতে ঠিক যা বুঝি আমরা। যুগধারা মেনে তো চলতে হবে!"

ডন এ্যালোসিয়াস হাসলেন, প্রশ্রয়ের হাসি একটুখানি।

"চলতেই হবে? এতই বাধ্যতামূলক ঐ যুগধর্ম মেনে চলা? আমার কথা যদি সকলের বিরক্তিকর মনে না হয়, একটা গল্প বলি তা হলে। গল্পও ঠিক নয়, একটা জনশ্রুতি। থাকুক, ভাল লাগবে না হয়ত আপনাদের।"

একসঙ্গে সকলে প্রতিবাদ করে উঠল—"সে কী? আপনার কথা ভাল লাগবে না? বিরক্তিকর লাগবে? হতেই পারে না। বলুন, বলুন—"

মর্গানা বলল—"বিরক্তি আসে না আপনার কথায়। তবে নিজেকে মনে হয় খুব ছোট্ট। অহমিকা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়তে চায়। আমার অন্ততঃ।"

"তুমি তো ছোট্টই!"—বললেন এ্যালোসিয়াস—"অবশ্য দেহের দিক দিয়েই ছোট্ট, অন্য দিক দিয়ে নয়। তাতে তোমার ক্ষোভ কেন? ছোট্ট জিনিসই তো মিষ্টি হয়।"

"ফাদার! আপনাকে ওটা মানায় না"—হেসে বলল মর্গানা—"নারীদের প্রশস্তিগান করা। আপনার বৃত্তির সঙ্গে খাপ খায় না।"

এ্যালোসিয়াস হেসে উঠলেন শব্দ করে—"সেনোরা রয়াল, আমার বৃত্তি আর তুমি শেখাতে এসো না আমাকে। কিন্তু যা বলতে চাইছিলাম, শোন। তোমাদের যখন আপত্তি নেই শুনতে, এমন একটি নরগোষ্ঠীর কথা তোমাদের আমি বলছি, একদা যারা ঠিক

যুগধারা মেনেই চলছিল। চলতে চলতে থেমে পড়ল এক স্থানে। এখনও তারা সেই বিরতির স্থানটিতেই রয়ে গিয়েছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা প্রায়ই দেশভ্রমণে গিয়ে থাকেন, পর্যটন করেন বহু বহু সুদূর দেশে, তাঁরা কেউ হয়ত পিত্তলনগরী নামে একটি স্থানের কথা শুনেছেন?"

এ-ওর মুখের দিকে চায়, কেউ সাড়া দেয় না এ্যালোসিয়াসের প্রশ্নে। অবশেষে তিনিই আবার বলতে লাগলেন—"সাহারায় যাঁরা ঘুরেছেন, তাঁরা শুনেছেন ওর কথা। কেউ কেউ নাকি দেখেছেনও, দূর থেকে ওর উজ্জ্বল প্রাসাদ-চূড়া আর গম্বুজগুলি। তা তাঁরা দেখে থাকুন বা না-থাকুন, প্রবাদ এইরকম যে পিত্তলনগরী সত্যিই আছে, প্রভু যীশুর প্রিয় শিষ্য জন ওর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রভুকে একসময় প্রশ্ন করা হয়েছিল জনের মৃত্যু হবে কবে কীভাবে। প্রভু তাতে উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি যদি বলি যে আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত জন পৃথিবীতেই অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য, তোমাদের তাতে কী?"

"তাই থেকেই প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল আস্তে আস্তে যে প্রভু যীশুর শিষ্যদের মধ্যে জনই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, যিনি মৃত্যুহীন। কিন্তু সেকথা থাকুক, গল্পটার কথাই বলি। অনেকে বিশ্বাস করেন যে মিসরের মহামরুর অনাবিষ্কৃত গোপন অঞ্চলে এমন এক মহানগরী আছে, যার বাড়ীগুলির ছাদ আর চূড়া পিতলের মত কোন উজ্জ্বল বস্তু দিয়ে গঠিত বলে মনে হয়। তার চারদিকে প্রাচীরও পিতলের। প্রাচীরের মাঝে মাঝে সিংহদ্বারগুলিও তারই। ওর চারদিকে একসময় ছিল এক বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র। সে-সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, সমুদ্রগর্ভের তরঙ্গায়িত বালুকাস্তর এখন শত শত মাইল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে ঐ পিত্তলনগরীকে অনধিগম্য করে রাখবার জন্য। ঐ নগরীতে বাস করে এক বিশেষ জাতির মানুষ, অতি সুন্দর আকৃতি তাদের, অনন্ত-যৌবন আর অনন্ত জীবন লাভের গোপন উপায় তারা আবিষ্কার করেছে। আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারই তাদের জানা। ঘর-সংসারের নিত্যকর্মে সে-সব নিয়তই ব্যবহার করে তারা। পৃথিবীর

কোন্ দেশে কোথায় কবে কী হচ্ছে, তার সংবাদ তখন তখনই তাদের কাছে পৌঁছে যায়, বায়ুতরঙ্গে আর আলোকরশ্মিতে ভর করে। পৃথিবীর রাজনীতির কচকচি আর পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহের রক্তারক্তি সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, ঠিক যেমন এই আমরা উদাসীন আমাদের আশে-পাশে পিঁপড়ের ঢিবির রাজনীতি আর রক্তারক্তি সম্পর্কে। ওরা মহাজীবনের যে-স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে এসব ব্যাপার তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। মানবজীবনে সত্যকার আনন্দ যে কী, তার গোপন উৎস যে কোথায়, তা আবিষ্কার করেছে তারা। সে-আনন্দ নিত্যই তারা উপভোগ করছে, আমরা যেমন এই মুহূর্তে উপভোগ করছি সান্ধ্যপবনে ফুলের গন্ধ।"

৬

ইদানীং প্রায়ই আর ম্যানেলা নিজে যায় না সীটনের কাছে দুধ রুটি পৌঁছে দেবার জন্য। প্লাজাতে আইরিশ জেক নামে একটা আধপাগলা ছেলে আছে, তাকেই ঠেলে পাঠিয়ে দেয় কাজটা সমাধা করে আসবার জন্য। আইরিশ জেক আসলে জাত্যংশে আইরিশ কিনা, তা সে নিজেও জানে না, জানে না এ-অঞ্চলের অন্য কেউও। কবে যে সে কীভাবে এসে পড়েছিল প্লাজাতে, প্লাজার মালিক তা জানলেও জানতে পারেন, অন্য সবাই সে-বিষয়ে অজ্ঞ। এবং বলা বাহুল্য, মালিককে ও-কথা তুলে বিরক্ত করার দুঃসাহস কারও নেই, লোক তিনি রাশভারী, কথা কইলে যদি পয়সা রোজগার না হয়, তাহলে সে কথা তিনি কইতে রাজী নন।

আইরিশ জেক ছেলেটা যেমন নোংরা, তেমনি অসভ্য। তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না সীটন। তবু ম্যানেলার বদলে সে যেদিন দেখা দেয় দুধের বালতি হাতে, সেদিন দূর থেকে তার শ্রীমূর্তি দর্শন মাত্রেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে। ম্যানেলার মত সুশ্রী সে না হতে পারে, কিন্তু ম্যানেলার মত বিরক্তও সে করবে না সীটনকে।

তাই বলে ম্যানেলা কি একেবারে ছেড়ে দিয়েছে মরণকুঠিতে আসাযাওয়া? একেবারেই না। আসে সে। প্রত্যহই আসে, একদিনও বাদ যাওয়ার যো নেই। আসে, কিন্তু দিনের আলো থাকতে আসে না। আসে, রাত্রের অন্ধকারে, লুকিয়ে লুকিয়ে। কাঠের গুঁড়ি গায়ে গায়ে খাড়া করে দেয়াল বানানো হয়েছে মরণকুঠির। দু'টো গুঁড়ির মাঝে ফাঁক আছে যেখানে, কাদা দিয়ে তা ভরাট করা হয়েছে। সে-কাদা আবার শুকিয়ে খুলেও পড়েছে এক এক জায়গায়, বাইরে থেকে সেখানে যদি দৃষ্টিসন্ধান করা যায়, ঘরের ভিতরটা চোখে পড়বেই। আলো জ্বেলে বেতের চেয়ারে বসে আছে সীটন, এক গাদা কাগজ অন্য একখানা চেয়ারে সাজিয়ে, এ-দৃশ্য প্রতি সন্ধ্যাতেই দেখতে পায়

ম্যানেলা। এইটুকু দেখতেই আসে সে। দরোজা খোলাই থাকে রাত দুপুর পর্যন্ত, কিন্তু তা দিয়ে ভিতরে ঢোকার, সীটনের সঙ্গে কুশলবার্তা-বিনিময়ের সাহস তার কোথায়? দেখলেই তো সীটন কুকুর-তাড়া করবে তাকে—"দূর হ' সর্বনাশী! আমার তপোভঙ্গ করতে এসেছিস! দূর হ। তা নইলে এক্ষুণি ভস্ম করে ফেলব।"

যা কথা হচ্ছিল। লুকিয়ে ছাড়া আসে না ম্যানেলা। তার না-আসাই এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীটন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাতেই। এমন সময় একদিন, পরিপূর্ণ দিবালোকে ম্যানেলা এসে হাজির। আজ দুধ আসবার কথা নেই প্লাজা থেকে। হপ্তায় দু'দিনের বেশী তা আসে না, দরকার হয় না আসার। দুধ আজ আসবার কথা নয়। ম্যানেলার হাতে বালতিও নেই দুধের।

সীটন আশ্চর্য বোধ করল। "কী ব্যাপার? তুমি যে?"

"আসতে কি মানা আমার?—ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন ম্যানেলার।

"মানা-টানার কথা হচ্ছে না। তুমি তো আসছ না আজকাল, আসছে সেই জন্তু ছেলেটা। তার উপরে ধর গিয়ে, কারোই তো আসবার দরকার আজ নেই, দুধ চাই না আমার। তাই বুঝতে পারছি না, তুমি এলে কি জন্য।"

"না এলে এই জিনিসটা আজ পৌঁছোতো না তোমার কাছে! অন্য কেউ নেই এখন প্লাজাতে, না আইরিশ জেক, না অন্য কেউ।" এই বলে বুকের ভিতর থেকে একখানা চিঠি বার করে সীটনের দিকে এগিয়ে দিল ম্যানেলা।

সীটন দেখল, চিঠি নয়, জিনিসটা একটা টেলিগ্রাম; প্লাজার ঠিকানায় এসেছে। ঠিক! সীটন আশাই করছিল, এইরকম একটা তার আসবে। সে নিজে আইরিশ জেকের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল যে টেলিগ্রাম দুই দিন আগে, তারই উত্তর এটা। জবাবী টেলিগ্রামের মাশুলও সে জমা দিয়ে রেখেছে আগেই। লেফাপা ছিঁড়ে খবরটা পড়ে ফেলল সীটন। পাঁচটা শব্দের একটা বার্তা। "কাল পৌঁছোবো তোমার কাছে। গোয়েন্ট"।

টেলিগ্রাম চোখের সামনে ধরে চিন্তায় ডুবে গিয়েছে সীটন, ম্যানেলা বলল—"তবু ভাল, তোমার খোঁজ নেবার লোক দুনিয়ায় আছে এখনো।"

"যা ভাবছ তা নয় ম্যানেলা," বলল সীটন—"নিজের গরজে তার করে নি। আমার জন্য যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গিয়েছে লোকটা, তাও নয়। আমি তার করেছিলাম, তাই ও আসছে।"

"আ-সছে? এই মরণকুঠিতে?"—চোখ ছানাবড়া ম্যানেলার।

"না, না, সে নিশ্চয়ই প্লাজাতেই এসে উঠবে। এই মরণকুঠির ঠিকানা তো সে জানেই না। প্লাজাতে উঠবে, এক রাত থাকে যদি, প্লাজাতেই থাকবে, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যে-ঘর আছে তোমাদের, থাকবে সেখানেই। যে-লোক আসছে, তার পয়সার অভাবও নেই, রুচিও আমার মত নয়। নিউইয়র্কের নাম শুনেছ নিশ্চয়? সেখানকার সবচেয়ে ধনী যারা, তাদেরই মধ্যে একজন এ।"

"তুমি ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে? এখানে আসার আগে? তুমিও তাহলে সামান্য লোক নও? স্বীকার কর একথা।"

"কী করে স্বীকার করব? আমি সত্যিই সামান্য লোক। ধনীর সমাজে ওঠাবসা দিনকতক করতে হয়েছিল অবশ্য। সেই যে সোনালি চুলের মালিক মহিলাটি এসেছিলেন একদিন, মনে আছে ত? তাঁরই পীড়নে পড়ে। তা জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে পড়লে তার যে-অবস্থা হয়, ধনীর সমাজে ঢুকে আমারও অবস্থা তাই দাঁড়ালো। ভাগ্যি ভালো যে খানিকটা ধড়ফড়ানির উপর দিয়েই ফাঁড়া কেটে গেল আমার। এক লাফে জলের মাছ জলে সটকে পড়লাম আবার।"

"ডাঙ্গায় যিনি তুলেছিলেন, তাঁর কাছে থেকে গেলেও মন্দ থাকতে না তুমি। মাছ-জন্ম ঘুচে ভেড়া-জন্ম হলে এমন কি লোকসান হত? সোনালি চুলের উনি লোক খারাপ নন। কতক্ষণ আর আলাপ হয়েছিল, তারই মধ্যে আমাকে আপন ক'রে ফেলেছিলেন।

"কী বলে গেলেন তিনি, তা ত কোনদিনই আমাকে বললে না তুমি!"

"তা কি বলি ?"—ম্যানেলা ছুটে পালালো, মার্গানা বলে গিয়েছে, ম্যানেলা যেন সর্বদা চোখে চোখে রাখে সীটনকে। সর্বনাশ! সে-কথাও কি বলা যায় নাকি এই গোঁয়ারকে? তাহলে এক্ষুণি সে এ-মুলুক ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে। যেমন একদিন নিউইয়র্ক থেকে চলে এসেছিল সিয়েরা মেডারে।

ম্যানেলা পালালো। অবশ্য সন্ধ্যার পরই আবার আসবে সে। এবার এসেছিল প্রকাশ্যে, সেবার আসবে গোপনে। যাহোক, সীটন ত আর তা টের পাবে না! সেজন্য কোন চিন্তাও নেই তার। সে উপস্থিত জরুরী ব্যাপারটা সম্বন্ধেই ভাবতে বসল। কীভাবে কথাটা তোলা উচিত হবে গোয়েন্টের কাছে, তাই নিয়েই তোলপাড় করল মনে মনে সারাদিন।

পরদিনই মিস্টার সাম গোয়েন্ট এসে প্লাজায় উপস্থিত। ইনিও নিজের গাড়ী নিয়ে এসেছেন। গাড়ী ম্যানেলা বহু দেখেছে প্লাজায়। অবশ্য যখনই দেখেছে, অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। গাড়ী সম্পর্কে তার যা-কিছু জ্ঞান, তা সেই দর্শন থেকেই লব্ধ। কিন্তু সেইটুকু জ্ঞানের ভিত্তিতেই ম্যানেলা নিজের মনে টিপ্পনি কাটল—"মিস রয়ালের গাড়ীর কাছে এ কিছুই না।"

মিস্টার গোয়েন্ট এলেন, একখানি কামরা তিনি টেলিগ্রাফেই ভাড়া করে রেখেছিলেন। সেখানে গিয়ে পোশাক ছাড়লেন, প্রাতরাশ করলেন। এ-সবের আগেই অবশ্য ম্যানেজারের কাছে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে সীটন প্লাজায় বাস করে না, বাস করে পাহাড়ের উপর মরণকুঠি নামক একটা ছোট্ট কাঠের কুঁড়েতে।

"কারণ?"—জিজ্ঞাসা করেছিলেন গোয়েন্ট। ম্যানেজার মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—"খেয়াল।"

গোয়েন্ট মাথা নেড়েছিলেন। খুবই সম্ভব। সীটন সম্বন্ধে এই ধারণাটাই তাঁর মনে সবচেয়ে স্পষ্ট যে লোকটি অতিমাত্র খেয়ালী। অনেক বিষয়েই অন্য লোকের সঙ্গে তার রীতি-চরিত্র মেলে না।

ম্যানেজার লোক দিতে চেয়েছিলেন, গোয়েন্টকে মরণকুঠি পর্যন্ত

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু গোয়েন্টই বললেন—দরকার নেই তার। ঐ ত পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পায়ে-চলা মেটে পথটা—দিব্যি চড়াই উঠে গিয়েছে ঘুরে ফিরে এঁকে বেঁকে। ঐ পথই ত পথ! মরণকুঠিই ত একমাত্র কুঁড়ে সিয়েরা-মেডারের এদিকটাতে! ঠিক চলে যাবেন গোয়েন্ট। ম্যানেজারকে হবে না লোক দিতে। ধন্যবাদ!

সত্যিই মরণকুঠি খুঁজে নিতে কিছুই কষ্ট হ'ল না গোয়েন্টের। কষ্ট হ'ল না এক নজরেই রোজার সীটনকে সনাক্ত করতেও। যদিও শেষেরটা অনায়াসেই হতে পারত। কারণ নিউইয়র্কে থাকাকালীন দাড়ি যেটা ছিল সীটনের মুখে, সেটা বর্তমানের দাড়ির তুলনায় নিতান্তই বালখিল্য। সেদিনে দাড়ি-গোঁফ সত্ত্বেও নাকমুখগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। এখন আর তা যায় না।

যা হোক গোয়েন্টকে দেখেই সীটন ব'লে উঠল—"আরে, আসুন, আসুন, এত ভোরেই এসে পড়বেন, তা ভাবি নি। প্রাতরাশ করেছেন? না ক'রে যদি এসে থাকেন, আজ আর হ'ল না প্রাতরাশ। আমার এখানে খাদ্য বলুন, পানীয় বলুন, দুধ ছাড়া আর কিছু নেই।"

"থাক, থাক, ধন্যবাদ!"—জবাব দিলেন গোয়েন্ট—"আমি দুধ খাওয়া ছেড়েছি ধাইয়ের কোল থেকে মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে। আমি প্লাজা থেকেই আসছি, খেয়ে এসেছি সেখানেই। আমার টেলিগ্রাম কি পেয়েছিলেন?"

"কাল দুপুরে পেলাম। পাওয়ার আশা করেছিলাম সকালেই।"

"মোটে না পেতেন যদি, তাতেও অবাক হওয়ার কারণ থাকত না। কারণ ওটাতে আমি ঠিকানা লিখেছিলাম 'প্লাজা', 'মরণকুঠি' লিখিনি। কিন্তু মরণকুঠি নাম কেন এই কুঁড়েখানার? আর, মরণকুঠিই নাম যখন এর, আপনার মত দারুণ রকম জ্যান্ত মানুষ এখানে কেন?"

সীটন তখন ব্যস্ত রয়েছে, বাইরের উঠোনে দু'খানা বেতের চেয়ার টেনে আনার ব্যাপারে। ছায়া বলতে এখানে ঘরখানারই ছায়া। বেলা দুপুর পর্যন্ত সে-ছায়ার অন্ততঃ কিছুটা অংশও ঠিক কোন্‌খানটাতে কায়ক্লেশে টিকে থাকবে, তা জানা আছে সীটনের। চেয়ার সেইখানে

সাজিয়ে সে যখন "আসুন, বসুন" ব'লে আহ্বান করল গোয়েন্টকে, তখন ভদ্রলোক মরণকুঠির নামকরণ-সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। বসেই জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপারখানা কী, বলুন ত! কী এই গুরুতর ব্যাপার? যার জন্য আপনি ডেকেছেন আমাকে, এই ভদ্র-লোক বর্জিত দেশে? কী এই ব্যাপার? নিউইয়র্ক থেকে আপনার আকস্মিক অন্তর্ধানের সঙ্গে কি কোন যোগ আছে এই ব্যাপারের? আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ব্যাপারে, হাজার হাজার পরিচিত লোকের মধ্যে আপনি বেছে বেছে আমাকেই ডাকলেন কেন এই সিয়েরা-মেডারে?"

"আপনার শেষ কথাটারই জবাব আগে দিই"—বলল সীটন—"বিশেষ ক'রে বেছে বেছে আপনাকেই ডেকেছি, তার কারণ আমার পরিচিতদের মধ্যে আপনিই একমাত্র লোক, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেনেটর।*

গোয়েন্ট একেবারে দিশেহারা—"সেনেটের সঙ্গে কী সম্পর্ক আপনার ব্যাপারের? খুলে বলুন।"

তখন খুলেই বলতে শুরু করল রোজার সীটন।

বিশ্বব্যাপী একটা মহাযুদ্ধ তার সমুখেই হয়ে গেল এই কয়েক বৎসর আগে। সারা বিশ্বে কী যে প্রলয় ঘটে গেল কয়েক বৎসর ধরে, তা সীটন ভুলতে পারে নি। মানুষ মরেছে কয়েক কোটি। হেন রাজধানী শহর নেই পৃথিবীতে, যা অল্পাধিক ধ্বংস হয় নি কামানের গোলায় আর বোমার আঘাতে। রক্তের নদী বয়ে গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে, মরুভূমির বুকে। সভ্য মানুষের কি উচিত হবে, তেমনি ধ্বংসলীলা আবারও কোনদিন কোন দেশে ঘটতে দেওয়া?"

গোয়েন্ট ভেবে পান না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর হওয়া সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে তিনি, সাম গোয়েন্ট, কী করতে পারেন। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করলেন—"সভ্য মানুষেরা ত যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রেই যাচ্ছে এমন কিছু বন্দোবস্ত করার জন্য, যাতে তেমনধারা যাচ্ছেতাই

---

* সেনেট=যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা। তারই সদস্যরা সেনেটর নামে অভিহিত।

কাণ্ড বারদিগর আর দুনিয়ায় না পারে ঘটতে। আশা করা যেতে পারে যে সে-চেষ্টার ফলে এমন একটা আন্তর্জাতিক সমঝোতা—"

রুখে উঠল সীটন—"সমঝোতা, না কচু! আপনি কিছু মনে করবেন না সিনেটর। আপনার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ছিল নিউইয়র্কে থাকতে, সেই সুবাদেই কষ্ট দিয়ে আপনাকে দৌড় করিয়েছি নিউইয়র্ক থেকে সিয়েরা-মেঁডার পর্যন্ত। আবার, আপনারই একতরফা দৌড়োদৌড়ির ফলে এই যে সাক্ষাৎটা হয়েছে আমাদের দুজনে, তার গোড়াতেই মেজাজ খারাপ ক'রে কথাবার্তা কইছি—শিষ্টাচার বহির্ভূত ধারায়। গোড়াতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এসব ধৃষ্টতার জন্য। কিন্তু সমঝোতার কোন দাম আছে দুনিয়ায়? কোন সন্ধিকে পবিত্র মনে করে জার্মানি? পরাজিত হ'লে তখন সে সন্ধি ক'রে। সে-সন্ধির ফলে কিন্তু তারা কেউ বেঁচে ওঠে না, যারা মারা প'ড়ছিল বিভিন্ন রণাঙ্গনে কয়েক বর্ষব্যাপী মহাযুদ্ধের কালে। সত্যি কিনা?"

"তা সত্যি বই কি!"—সায় দিতে বাধ্য হন গোয়েন্ট।

"তাও তাদের অপমৃত্যুকে সার্থক মনে করা যেতো, যদি সন্ধির সর্ত জার্মানরা মেনে চলবে বলে আশা করা সম্ভব হত। আপনি বলুন, আপনি পারেন সে-রকম আশা করতে? তাদের কর্মসূচি অনুধাবন করার পরেও? তাদের রীতি-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করার পরেও? আশা করতে পারেন যে ঐ ঠুঁটো জগন্নাথ লীগ-অব-নেশনস্-এর নিরীহ সুপারিশগুলোকে কোন মর্যাদাই তারা দেবে কোন-দিন?"

গোয়েন্ট পাশ কাটিয়ে গেলেন—"না যদি দেয় মর্যাদা, আবার যুদ্ধ হবে। এবারেও যেমন মিত্রশক্তি যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিল, সেবারেও হবে তেমনি। আশা করা যায়, সেবারেও জয়লক্ষ্মী আমাদেরই বরণ করবে। কারণ আমরা ত ন্যায়ের পক্ষ ছাড়া অস্ত্রধারণ করি না কখনো।"

গোয়েন্টের কথার শেষাংশ বুঝি কানেই তুলল না সীটন। প্রথম

দিকটাতে ঐ যে গোয়েণ্ট বলেছেন—'সেবারেও হবে যুদ্ধ', তারই উপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলের নিকটবর্তী ফুটবলের উপরে গোলকীপারের মত। "সেবারেও যুদ্ধ হবে," ঠিক বলেছেন আপনি। "সেবারেও কোটি মানুষ মরবে। সেবারেও রক্তনদীর সৃষ্টি হবে দেশে দেশে। অবিচলিতভাবে আপনি বলতে পারছেন আবারও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কথা। কারণ সে-যুদ্ধে আপনি নিজে যোগ দেবেন না তরোয়াল হাতে করে, বা আপনার ছেলেও দেবে না, কারণ যতদূর আমি জানি-ছেলে আপনার আদৌ নেই।"

গোয়েণ্ট স্বভাবতঃই বিরক্ত হলেন—"অবিচলিভভাবে কথা কইছি ব'লে আপনার যদি রাগ হয়, তাহলে আমি নাচার। বিচলিত হয়ে করব কী, বলতে পারেন? একটা দেশ যদি অবুঝ হয়, গোঁয়ার স্বার্থান্ধ হয়, অন্য দেশের ভালোমন্দর, এমন কি নিজেদেরও ভালোমন্দর দিকে না তাকায়, সে-অবস্থায় যুদ্ধ না হয়ে উপায় কী? লীগ-অব-নেশনস্ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কী করবে সেক্ষেত্রে? যুদ্ধ হলে মানুষ মরবে। এ ত সবাই জানে। কিন্তু জেনেশুনেও সবাই বলবে যে যুদ্ধই করতে হবে এখন। ও-ছাড়া পথ নেই আর।"

চেয়ারে বসেছিল সীটন, লাফিয়ে উঠল এইবার। স্রেফ উত্তেজনায়! অসহ্য উত্তেজনায় সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "কে বলে, আর পথ নেই? আছে পথ, আমি বলছি, পথ আছে। সে-পথ আমিই আবিষ্কার করেছি। দীর্ঘ সাধনায়। সিয়েরা-মেডারের বনবাসে আসার ঢের দিন আগে থেকেই আমি শুরু করেছি সে সাধনা। অবশেষে সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করার পরে, যুদ্ধ নিবারণী অমোঘ শক্তির অধিকারী হয়ে তবে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি—"

সীটনের কথার তোড়ে ভেসে যাচ্ছেন যেন গোয়েণ্ট। ঠিক যেন অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি। হাঁইফাঁই করতে করতে বললেন—"আমায় কেন? আমায় কেন ডেকেছেন? আমি কী করব?"

"আপনি মার্কিন সেনেটর। সেনেটকে বলবেন আপনি—"চিরতরে যাতে যুদ্ধবিগ্রহ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে পৃথিবী থেকে, তারই অব্যর্থ উপায় আবিষ্কার করেছে রোজার সীটন। সে-উপায়টি তোমরা এখন কাজে লাগাও সমগ্র মানবজাতির মুখ চেয়ে।"

৭

সিনেটর সাম গোয়েন্ট হাঁ ক'রে ফেললেন অসীম বিস্ময়ে।

যুদ্ধবিগ্রহ চিরতরে বিলুপ্ত হবে? তারই উপায় আবিষ্কার করেছে রোজার সীটন? যাঃ, মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে লোকটার। হবে না? এত গরম এই ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাড়া পাহাড়ে, এখানে এক বোঝা দাড়ি-গোঁফ মুখে, এবং আর এক বোঝা ঝাঁকড়া চুল মাথায় নিয়ে কোন লোক যদি সারাদিন বসে থাকে রোদ্দুরে, তার যদি মাথা খারাপ না হবে, কার হবে তাহলে শুনি?

সেই যে হাঁ ক'রে ফেলেছেন গোয়েন্ট, সে-হাঁ আর বোজে না। অগত্যা সীটনই বিশদ ব্যাখ্যা শুরু করল তার পিলে-চমকানো উক্তির। "আপনি বিশ্বাস করছেন না। দোষ দিতে পারি না আপনার। বিশ্বাস করতে হলে আগে বুঝতে চায় আধুনিক শিক্ষিত মানুষ। না-বুঝে বিশ্বাস করা, জংলী বর্বরদের পক্ষেই সাজে, যারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েই জন্মায়, সেই সর্বগ্রাসী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মরে। আপনি সে-শ্রেণীর লোক নন, কাজেই—

"শুনুন ব্যাপারটা মন দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে সভ্য জগতে এমন একটা জাতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যাদের বলা যেতে পারে স্বভাবতঃই যুদ্ধবাজ। জাতি হিসাবেই স্বভাবদুর্বৃত্ত তারা। সহাবস্থানে তারা বিশ্বাসী নয়। কারণ অন্য কাউকেই তারা জ্ঞানবুদ্ধি বা সভ্যতার সংস্কৃতিতে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না। পিঁপড়ের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান সম্ভব হতে পারে না। পিঁপড়ে সমুখে পড়লেই তাকে জুতোর তলায় পিষে মারতে হবে। না মারলে সেই পিঁপড়েই সুযোগ সুবিধামত একসময় জামার ভিতর ঢুকে পড়বে তোমার, দেবে কামড় বসিয়ে। তাতে অবশ্য মারা পড়বে না তুমি। কিন্তু জ্বলুনি পুড়ুনি

খানিক সইতেই হবে। কেন যেচে তা সইতে যাওয়া ? সমুখে পেলেই মেরে ফেলে দাও আগেভাগে।

"এই যাদের জীবনদর্শন, তাদের সঙ্গে আমাদেরও সহাবস্থান সম্ভব নয়। কাজেই, হয় তারা থাকবে তুনিয়ায়, নয় ত থাকব আমরা। উভয়েই পারি থাকতে, যদি তাদের সম্ঝিয়ে দিতে পারি যে বিন্দুমাত্র আগ্রাসনের আগ্রহ তাদের দিক থেকে দেখা গেলেই আমরা তাদের জুতোর তলায় পিষে মারব, সে-শক্তি আমাদের আছে।

"এখন আমার বক্তব্য হ'ল এই যে সে-শক্তি আমি আয়ত্ত করেছি। কথার কথা বলছি, আজ যদি জার্মানি বা অন্য কোন দেশ যুদ্ধ বাধাতে চায় গায়ে পড়ে, আমি তাকে সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে হাঁক ছেড়ে বলতে পারি—'খবর্দার ! এক পা এগিয়েছ কি তোমাকে ভস্ম ক'রে ফেলব। যুদ্ধবিগ্রহ বাধানো চলবে না আর। তোমাদের পরস্বহরণের প্রবৃত্তিকে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার মত অস্ত্র আমার আছে। লক্ষ সৈনিকের একটা বাহিনী আমার দরকার নেই, দরকার নেই অগ্নিবর্ষী কামানের বহর, বা বোমাবর্ষী বিমানের বহর, একখানি ছোট্ট প্লেন মেঘলোকের উপর দিয়ে উড়ে যাবে কখন, তোমরা টেরও পাবে না। টের পাবে, যখন সেই ছোট্ট প্লেন থেকে পড়বে একটা ছোট্ট সরুপানা চোঙ্গ তোমাদের দেশের মাথায়। কিংবা বলতে পারি, টের পাবার আগেই তোমাদের দেশ পুড়ে ছাই হবে, গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে অতল সমুদ্রে। সর্বধ্বংস ! প্রলয় একেবারে ! তারই শক্তি হাতে নিয়ে বসে আছি আমি, বিশ্বজগতের বুক থেকে যদি একেবারে মুছে যেতে না চাও, খবর্দার, বিশ্বজগতের শান্তিভঙ্গ করো না। যেমন আছ, অন্য পাঁচটা জাতির সঙ্গে মিলে মিশে সুবোধ বালকের মত শান্তিতে দিন যাপন কর।' "

এতক্ষণ পরে হাঁ বুজল গোয়েন্টের, বাক্যস্ফূর্তি হ'ল তাঁর। "সেকথা বিশ্বাসই বা করবে কেন তারা ? ভয় পেয়ে নিরস্তই বা হবে কেন ?"

"অবশ্যই করবে। অবশ্যই হবে। কারণ আমি হাতেকলমে দেখিয়ে দেব আমার অস্ত্রের মহাশক্তি। ধরুন, সাহারা মরুভূমিতে

ডেকে পাঠাব পৃথিবীর তাবৎ জাতির প্রতিনিধিকে। তাদের সমুখেই মরুর বুকে নিক্ষেপ করব আমার অমোঘ অস্ত্র। তাদের অবশ্য উপরের আকাশে থাকতে হবে নাগালের বাইরে।

সাহারার মরু একদিন সমুদ্র ছিল, তা জানেন ত! আমার অস্ত্রাঘাতে আবার সমুদ্র সৃষ্টি হবে সেই মরুর বুকে। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধিরা আকাশ থেকে দেখবে সেই মহাবিপর্যয়। তখন আমি ডেকে বলব তাদের, "এই অস্ত্র তোলা রইল আমার ভাণ্ডারে, যেদিন দেখব যে পৃথিবীর কোন অংশে কোন জাতি যুদ্ধ বাধাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, অমনি সেই জাতির মস্তকে নিক্ষেপ করব এই সর্বধ্বংসী অস্ত্র।"

"ভাবুন মিস্টার সাম গোয়েন্ট, আমার অস্ত্রের শক্তি চোখে দেখার পরে, এবং আমার হুঁশিয়ারি কানে শোনার পরে কোন জাতিই কি যুদ্ধ বাধাবার সাহস পাবে আর? যার যত কামান আর যত বিমানই থাকুক, আমার অস্ত্রের প্রতিরোধ করবে, এমন শক্তি ত কারও নেই!"

গোয়েন্ট নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন সীটনের দিকে। সে যে অস্ত্রের দুর্বার শক্তি সম্বন্ধে শতকরা একশো ভাগ সচেতন, তা তার চোখের কোণে আগুনের ঝলক দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু—

একটা কথা গোয়েন্ট বুঝতে পারছেন না। তাঁকে এসব কথা কেন বলে সীটন? টেলিগ্রাম ক'রে সুদূর নিউইয়র্ক থেকে তাঁকে টেনে আনার মানে কী লোকটার? সাহারাতে সে যদি পরীক্ষা দিতে চায় তার অস্ত্রের, গোয়েন্ট তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? সাহারা ত গোয়েন্টের জমিদারি নয়! সেখানকার কিয়দংশে রাজা হ'ল মিশর দেশ, কিয়দংশে ফ্রান্স। গোয়েন্ট ঠিক জানেন না, মরক্কোর এবং আরও কোন কোন দেশেরও হয়ত কিছু কিছু মালিকানা আছে ঐ মরুর বিভিন্ন অংশে। এসব দেশের গবর্নমেন্ট ত গোয়েন্টকে এক-গাছা তৃণেরও সমান মূল্য দেবে না! সীটনের মত শিক্ষিত লোক কি এই মোটা কথাটাই ভুলে গেল?

মনের কথাকে একসময়ে মুখেই প্রকাশ করলেন তিনি—"তা

আমাকে এ-ব্যাপারে জড়াতে চাইছেন কেন আপনি? আমি কীভাবে পারি আপনার সাহায্য করতে?"

"তাও বুঝলেন না? আপনি সেনেটর একজন। আপনাকে দিয়েই আমার ব্যাপারটা আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারে পেশ করতে চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আমার আবিষ্কারের কথা জানানো, প্রত্যেককে হুঁশিয়ারি দেওয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধাবার পরিকল্পনা চিরতরে বর্জন করারই সময় এসেছে তাদের, প্রয়োজনে তাদের ডেকে এনে সাহারায় বা ঐরকম অপর কোন জনহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমার অস্ত্রের শক্তিটা চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া। এসব ত আমার মত সামান্য নাগরিকের পক্ষে সহজ নয়! অথচ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সেকাজ অনায়াসসাধ্য। সবদেশেই দূতাবাস আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, সেই সব দূতের মারফতই কথাবার্তার চালাচালি হতে পারে। আর বিজ্ঞানী হিসাবে আমার ত কর্তব্যও, এরকম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা সর্বপ্রথমে গবর্নমেণ্টকেই জানানো! সেই কাজগুলিই আপনি ক'রে দেবেন ব'লে প্রত্যাশা আছে আমার। আমার পরিচিত মহলে আপনি ছাড়া এমন অন্য কেউ নেই, রাষ্ট্রকর্ণধারদের কাছে গিয়ে যিনি উত্থাপন করতে পারেন একথা।"

সীটন কথা শেষ ক'রে একান্ত আগ্রহে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। গোয়েণ্ট এখন কী বলেন? এরকম একটা অভূতপূর্ব ব্যাপারে তিনি এসে জড়িয়ে পড়বেন হঠাৎ, এ ত কল্পনার বাইরে ছিল তাঁর! সারা পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ে কথা! সীটন যা বলছে, তাঁকে অতিরঞ্জন ব'লে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আবিষ্কার ত মাঝে মাঝেই হচ্ছে পৃথিবীতে! চমকপ্রদ! যুগান্তকারী। গোলা বারুদ কামান ট্যাঙ্ক বিমান বোমারু রাডার সাবমেরিন! যখন যেটা এসেছে, পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছে এক একটা। সীটনের আবিষ্কার যে তাদের চেয়েও মারাত্মক একটা কিছু অনায়াসেই হতে পারে, কে তা অস্বীকার করবে?

না অগ্রাহ্য করার মত, উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার এটা নয়।

মার্কিন দেশের, সম্ভবতঃ সারা পৃথিবীর ভালোমন্দর উপরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করবে সীটনের এই অভিনব আবিষ্কার, যদি অবশ্য সীটনের দাবি ভিত্তিহীন না নয়।

ভিত্তিহীন ব'লে মনে করার কোন কারণ ত গোয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন না। সীটনকে তিনি বরাবরই দেখছেন একটু খেয়ালী ধরনের মানুষ। সেই খেয়ালিপনার কথাটুকু মনে রাখা যায় যদি, ওর আচরণে পাগলামির কোন চিহ্নই নেই। নাঃ, উড়িয়ে দেওয়া যায় না ওর কথা। ও যে নিউইয়র্কে থাকতেও প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ব'লে স্বীকৃতি পেতো, তা ত জানেন গোয়েন্ট !

"মিস্টার সীটন ! আপনার কথাগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কথিত এই নবাবিষ্কৃত শক্তি এতই চমকপ্রদ যে হঠাৎ হাঁ কি না ব'লে আপনার প্রস্তাবের যাহোক একটা উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে। অনেক ভেবে দেখতে হবে। অনেকের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তার আগে আমি কোন কথাই বলতে পারব না আপনাকে।"

"আমি কি খুব বেশী একটা কিছু চাইছি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে ? আবার একটা মহাযুদ্ধে রক্তবন্যা বয়ে যাক পৃথিবীতে, এটা নিশ্চয়ই চান না সরকার ? তা যদি না চান, যুদ্ধ বন্ধ করবার অব্যর্থ উপায় আমি হাতে তুলে দিতে চাইছি তাঁদের। তাঁরা তা না নেবেন কেন ? উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবেন না কেন ? প্রয়োগ ঠিক নয়, প্রয়োগের ভয় দেখানো। ধরুন জার্মানি বেয়াড়া গাইছে। মার্কিন সরকার হুমকি দিলেন—"ব্যস ! আর এক পা এগিয়েছো কি জার্মানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত ক'রে দেব আমরা।' তাতে কাজ হবে না, বলতে চান ?"

"তা হয়ত হবে"—দোয়ামনা ভাবে জবাব দিলেন গোয়েন্ট—"কিন্তু মার্কিন সরকারকে দিয়ে সেই হুমকি দেওয়ানো সম্ভব হবে কি না, আমি সেইটিই বুঝতে পারছি না।"

"বলেন কী ? হুমকিটা ফাঁকা নয়, যে-কোন দেশ নিমেষে ধ্বংস

ক'রে দেবার শক্তি মার্কিনের আছে, একথা জেনেও তাঁরা দেবেন না হুমকি ? কেন দেবেন না ?"

"দেবেন না, কারণ এমন অনেক লোক এদেশে আছে, সরকারের উপরে যাদের প্রভাব আমার চাইতে অনেক বেশী, আর যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাক, এরকমটা যাদের অভিপ্রেত হতেই পারে না।"

"বলেন কী ?"—লাফিয়ে উঠল সীটন চেয়ার ছেড়ে—"এমন লোকও আছে, যারা চায় না যে যুদ্ধবিগ্রহ অতীতের বস্তুতে পর্যবসিত হোক ?"

"আছে এমন লোক। প্রকাণ্ড ধনী, প্রচণ্ড প্রভাবশালী লোক তারা।"

"তারা ত জানে যে যুদ্ধ মানেই লক্ষ লক্ষ লোকের অপমৃত্যু !"

"জানলেই বা ? তারা নিজেরা ত মরছে না ! বরং আগের চেয়েও আরও বেশী ফুলে উঠছে অস্ত্র বিক্রি ক'রে, রসদ সরবরাহ ক'রে, আনুষঙ্গিক আরও হাজার রকমে।"

"এমন নরপিশাচও আছে এদেশে ?"

"সব দেশেই আছে। আমার খুবই আশঙ্কা হয়, আপনার অমোঘ অস্ত্রকে কোন দেশই স্বাগত জানাতে চাইবে না। চাইত, যদি— রাষ্ট্রপরিচালনার ভার থাকত সেই সব দরিদ্রের হাতে, যুদ্ধ বাধলে প্রাণ দেবার জন্য যাদের যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায় রাষ্ট্রকর্ণধারেরা। যাহোক, আমি আপনাকে কিছুই বলছি না আজ। যাই ওয়াশিংটনে, কথাবার্তা বলি, তারপর আপনাকে টেলিগ্রাম করব।"

গোয়েন্ট উঠে পড়লেন—"এমন বিরাট আবিষ্কার, তার গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা কোথায় করলেন ? ল্যাবরেটরি কোথায় আপনার ? এই কুঁড়ের ভিতর নয় নিশ্চয়ই ?"

"নিশ্চয়ই না। কুঁড়ের ভিতরেও না, অন্য কোন জায়গাতেই না। যা করি, এইখানে এই খোলা আকাশের নীচে বসেই করি। তাহলে যদি সন্দেহ থাকে আপনার, আমার অস্ত্রের বিশ্বধ্বংসী শক্তির সম্বন্ধে, তাহলে বলুন, হাতে কলমে পরীক্ষা দিয়ে দিই এক্ষুণি। এই সিয়েরা-

মেডার পর্বতটাকেই গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলব? ঠিক গোনাগুন্তি এক মিনিট সময় লাগবে—"

"ওরে বাবা, না, না, না"—ককিয়ে উঠলেন গোয়েণ্ট।

গোয়েণ্ট ফিরে এলেন প্লাজাতে। গাড়ী আছে সঙ্গে, ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসেই রওনা হয়ে যেতে পারেন এক্ষুণি নিউইয়র্কের পথে। কিন্তু তাতে আর উৎসাহ হ'ল না তাঁর। আজ এখানেই বিশ্রাম নেবেন তিনি। পাহাড়ের নীচে স্বাস্থ্য নিবাসের এই হোটেলটি, দেখতে বেশ ভালই। আশানুরূপ আরাম-বিরামের ব্যবস্থাও নিশ্চয় আছে এখানে।

ডিনারের দেরি আছে। ততক্ষণ হোটেলের বাগানে একটু বেড়ালে দোষ কী? বেড়াতে বেড়াতে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেও দেখা যেতে পারে, সীটনের ব্যাপারটা। লোকটা নিউইয়র্কে থাকতে তাঁদের সমাজেরই লোক ছিল। উঁচুতলার অভিজাত সমাজের। সে-সমাজে আসন পেতে পারে, এমন কোন সুপারিশ সীটনের পিছনে ছিল না গোড়ায়। অর্থের দিক দিয়ে সে ছিল একান্ত দরিদ্র। চেহারার দিক দিয়ে ছিল একটা ভালুক বিশেষ। এমন কি কথাবার্তাতেও সে ছিল অমার্জিত, কদাচিৎ বা অভব্যই।

থাকার মধ্যে ছিল তার সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি। সেটা এই যে সে নাকি খুব উঁচুদরের বিজ্ঞানী একজন। দস্তুরমত প্রতিভাধর। মার্কিন মুলুকের শ্রেষ্ঠ গবেষকেরাও নাকি আগামী দিনের সূর্য বলে অভিহিত করে থাকেন তাকে।

হ্যাঁ, ছিল ঐ জনশ্রুতি। কিন্তু তাতে কার কী এসে গেল? প্রতিভা? কত আঁস্তাকুড়ে কত প্রতিভা গড়াগড়ি যাচ্ছে, তার কেউ খোঁজ রাখে নাকি? দূর! দূর! অভিজাত সমাজ প্রতিভার কদর করতে যাবে কোন্ দুঃখে? তাদের কাছে কদর আছে শুধু ঝকঝকে মোটরগাড়ির, ঝলমলে রেশমী পশমী পোশাকের, আদবকায়দায় দুরস্ত চলনফেরনে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাঙ্কে মজুদ কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের। তা এ-সব জিনিসই ত একদম বাড়ন্ত সীটনের, উঁচু মহল

কেন নিজের দরোজা তার মত দীনহীন অর্বাচীনের সমুখে খুলতে যাবে ?

খুলবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল, সে-দরোজা হাট হয়ে খুলে গেল একদিন, যেন এক যাত্নদণ্ডের স্পর্শে। সে-যাতুদণ্ডটি মর্গানা রয়ালের।

মর্গানা রয়াল! সারা তুনিয়ার অন্যতমা ডলার-কুইন। স্বভাবতঃই সে অভিজাত সমাজের শিরোমণি। তার কথায় নিশীথে সূর্যোদয়ও হতে পারে এদেশে, সেইই রোজার সীটনকে একদিন নিয়ে এল নিজের বাড়ীতে। অতিথি আরও অনেক ছিলেন তখন সেখানে, প্রত্যেকেই এক একটি সমাজসিংহ বা সিংহিনী। তাদের কাছে মর্গানাই পরিচয় করিয়ে দিল সীটনের—"বিজ্ঞানের জগতে আগামী দিনের সূর্য, এই আমাদের রোজার সীটন, এঁর পদার্পণে গৃহ আমার ধন্য হ'ল আজ।"

ব্যস, এক মুহূর্তে অবহেলিত, অনাদৃত, নরাকার ভালুকটা, সেই রোজার সীটন হয়ে দাঁড়ালো সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণের মাথার মণি। "তোমার সঙ্গে আলাপ কী ক'রে হ'ল গো মিস রয়াল ?"—প্রশ্ন করেছিল কোন কোন কৌতূহলী বন্ধু। মর্গানা সবাইকে একই জবাব দিয়েছিল—"এককর্মা ভবেৎ সুহৃৎ"—জানো না ? বিজ্ঞানের ছাত্রী ত আমিও! অন্ততঃ যাতায়াত রেখেছি ও-মহলে।"

রটে গেল এই থেকে এক আজগুবি কথা। ধনকুবের তুহিতা মর্গানা রয়াল নাকি বরমাল্য দিতে চলেছে ঐ দাড়িওয়ালা ভালুকটাকে। রটনাটা যথাসময়ে সীটনেরও কানে পৌঁছোলো। এবং পৌঁছোনো মাত্র তল্পি গুটিয়ে সে চম্পট দিল তুনিয়ার অপর প্রান্তে, সিয়েরা-মেডারে। রেস্ত কম, তাই প্লাজার হোটেলে ঠাঁই না নিয়ে উঠল গিয়ে কাঠের কুঁড়ে মরণকুঠিতে। সস্তা ত বটেই, একান্ত নিরিবিলি জায়গাও। তার গোপন গবেষণার পক্ষে অতি উপযোগী।

যাক, ঐ মর্গানা রয়ালের নিউইয়র্কের প্রাসাদেই সেনেটের সাম গোয়েণ্টের আলাপ-পরিচয় এই নরাকার ভালুক সীটনের সঙ্গে। প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ব'লে সীটনের খ্যাতি তখনই শোনা ছিল

গোয়েন্টের।' সেই সুবাদেই সীটনের তার পাওয়া মাত্র গোয়েন্ট ছুটে এসেছেন এতদূরে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। বলা যায় কী? বিজ্ঞানী যখন, হয়ত পরশ পাথর-টাথর তৈরী ক'রে ফেলেছে একটা। তা যদি হয়, নিজের লোহালক্কড়গুলোকে সোনায় পরিণত করার এ-সুযোগ কেন তিনি ছাড়বেন?

এসেছিলেন সেই রকমই কিছু একটা আশা নিয়ে। এসে যা শুনলেন, তাতে তাঁর ত চক্ষুস্থির! বিশ্বধ্বংসী শক্তির অধিকারী হয়েছে সীটন। সে-শক্তি এখন সে প্রয়োগ করতে চায়। সারা বিশ্বে অনন্ত-কালের জন্য শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কেউ কখনো শুনেছে নাকি এমন কথা? শান্তি কোনদিন চিরস্থায়ী হতে পারে? হয়েছে নাকি কখনো? যা হবার নয়, তা হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে গেলে উল্‌টে সীটনের নিজেরই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অসীম শক্তিধর ঐ অস্ত্র সীটনের। তার নিজের কথাতেই প্রকাশ। সাহারা মরুভূমিকে সে নিমেষে সমুদ্রে পরিণত ক'রে দিতে পারে। ঠাট্টার ছলে গোয়েন্টকেই সে বলেছিল—"এই সিয়েরা-মেডার পর্বতটাকেই গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ফেলব? ঠিক এক মিনিট সময় লাগবে।" সর্বনাশ!

তবে ভরসার কথা, আপাততঃ কিছুদিন সে-রকম হঠকারিতা সে নিশ্চয়ই করবে না। আপাততঃ সে অপেক্ষা করবে, গোয়েন্টের দৌত্যের ফলাফলটা দেখবার জন্য। গোয়েন্ট যদি মার্কিন সরকারকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন, সীটনের আবিষ্কারটি নিজেদের হেফাজতে গ্রহণ করতে, তাহলে আর কোন গোলমাল হয়ত করবে না সে। মুস্কিল বাধবে হয়ত তখনই, যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেন সরকার।

সে পরের কথা। আপাততঃ সীটন কোন গোঁয়াতুর্মি করবে না ব'লেই বিশ্বাস গোয়েন্টের।

তবু—

গোঁয়াতুর্মি সে করবে না হয়ত। কিন্তু দুর্ঘটনা ত যখন তখন ঘটে যেতে পারে! প্রলয় ঘটাবার মত শক্তি যে অস্ত্রের, অহরহ তাই নিয়েই

দ্য সিক্রেট পাওয়ার-

“মেডার পর্বতটাকেই গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলব!” [পৃঃ ৬২

নাড়াচাড়া করছে সীটন। এক মুহূর্তের অসাবধানতায় কী অনর্থই না ঘটে যেতে পারে? অস্ত্রটা কী-ধরনের, গোয়েন্ট জানে না। যদি বোমাজাতীয় হয়, যখন-তখনই ত তা ফেটে যেতে পারে! বিশ্ব ধ্বংস হোক বা না-হোক, নিজে সীটন অনায়াসেই ধ্বংস হতে পারে তার ফলে। দেহটা খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে তার। পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে চক্ষুর নিমেষে। নাঃ, এ এক মহা দুশ্চিন্তারই ব্যাপার হ'ল। না হোক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মোটামুটি আলাপ আছে যখন সীটনের সঙ্গে, তার জীবন যে-কোন মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে, একথা জেনেও উদাসীনভাবে গোয়েন্ট নিউইয়র্ক চলে যান কেমন ক'রে?

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দারুণ রকম চিন্তা করছেন গোয়েন্ট। হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটি সুন্দরী তরুণী তাঁকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। না, ভদ্র ঘরের মেয়ে ব'লে মনে হয় না ঠিক। পোষাকে আশাকে পারিপাট্য যতই থাকুক, তা থেকে ভব্য চেহারা তেমন ফোটেনি। অর্থাৎ, মেয়েটি এ-হোটেলের অতিথি বোধ হয় নয়। পরিবেশিকা পরিচারিকা শ্রেণীর কিছু একটা হতে পারে।

গোয়েন্ট তাকে লক্ষ্য করছেন দেখে সে এগিয়ে এসে বলল—"শুভ সন্ধ্যা স্যার। আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ত?"

"মিস্টার সীটনের কথা বলছ? তা হয়েছে দেখা। কিন্তু তুমি কী ক'রে জানলে যে সীটন আমার বন্ধু?"

"বন্ধু না হলে তার টেলি পাওয়া মাত্র আপনি ছুটে আসেন নিউইয়র্ক থেকে? আমি জানি যে ব্যাপারটা! আপনার টেলি আমিই ত পৌঁছে দিয়ে এলাম মরণকুঠিতে! তা দেখুন, আপনার বন্ধুটিকে আপনি সঙ্গে করেই নিয়ে যান না!"

গোয়েন্ট এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে হেসে ফেললেন তক্ষুণি। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন—"তুমি তাকে তাড়াবার জন্য অত ব্যস্ত কেন?"

"তাড়াবার জন্য ব্যস্ত? মোটেই না! সে যদি চিরদিন এখানে থেকে যায়, আমি ত ব'র্তে যাই। কিন্তু, মিস রয়াল ব'লে গিয়েছিলেন —ওর জীবন এখানে যে-কোন সময় বিপন্ন হতে পারে। তাই—হ্যাঁ,

ও চ'লে গেলে আমি খুশী হব না। কিন্তু চ'লে গেলে যদি ওর জীবনের ভয়টা কেটে যায়, ত ও যা'ক—"

কথার শেষ দিকে গলা ধ'রে এল ম্যানেলার।

গোয়েন্ট ভাবলেন খানিকটা। তারপর অনেক কথাই তাঁর হ'ল ম্যানেলার সঙ্গে। সীটন সম্বন্ধে তার মনোভাব মর্গানার কাছেও গোপন করেনি ম্যানেলা, গোয়েন্টের কাছেও করল না। গোয়েন্ট অবশেষে বললেন—"ওকে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিস রয়ালই যখন পারেন নি নিয়ে যেতে, আমি কোন্ ছার। কিন্তু মিস্ রয়ালের কথাই আমিও আর একবার বলছি তোমাকে। জীবন সংশয় বিপদ সীটনের যে-কোন মুহূর্তে হ'তে পারে। তুমি যখন ভালবাস তাকে, তখন যথাসম্ভব তাকে আগলে রাখার চেষ্টা কর নিশিদিন।"

৮

লাল আকাশ মিসরের। আগুন যেন ছড়িয়ে পড়ছে সেই আকাশ জুড়ে। নীচে নীল নদ বইছে ধীরে, অতি ধীরে। কাদায়-ভরা চড়া-গুলো থেকে ঘোলাটে লাল রং ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃদু মৃদু ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে। বড় বড় পাম আর ছোট ছোট নলখাগড়া, সবই সিঁদুরের মত রং। সৈকতে যেখানেই বালুকার বিস্তার, সোনালি একখানা গালিচাই যেন বিছানো সেখানে।

সারা কাইরো রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে। বাসিন্দা এবং বিদেশী নির্বিশেষে। বিদেশীরা ত প্রাণান্তেও একটা সূর্যাস্ত বাদ পড়তে দেবে না। পয়সা খরচ ক'রে আসতে হয়েছে, সেটা উশুল ত করতে হবে! আর কাইরো থেকে দূরে, পিরামিডের চূড়া যেখানে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, আরব গাইড সঙ্গে নিয়ে দলে দলে পর্যটক ভিড় করেছে সেখানে, অবাক বিস্ময়ে উপর পানে চাইছে তারা।

আকাশে একটা আশ্চর্য কিছুই দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যি। রক্তিম আকাশে শুভ্র একটা কিছু উড়ে যাচ্ছে। হুবহু একটানা উড়োজাহাজ। কিন্তু নিঃশব্দ উড়োজাহাজ। যে-কোন বিমান আকাশ-পরিক্রমার সময় এমন আওয়াজ তুলবে, যাতে নীচের পৃথিবীর লোক সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেও আকাশপানে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হয়। এ-বিমানটা কিন্তু ভুলক্রমেও কোন আওয়াজ দিচ্ছে না। হাওয়া কেটে অবলীলায় উড়ে যাচ্ছে ঠিক এক অতিকায় বিহঙ্গের মত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা। কোন প্লেন যা কখনো করে না, এ-প্লেনের ব্যাপারে সেইটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশেষ করে। ডানা! ঠিক পাখীর মতই ডানা ঝাপটাচ্ছে বিমানখানা। বিমানই যদি হয়, নতুন রকমের বিমান।

এত উপর দিয়ে উড়ছে ওটা, না চালক, না যাত্রী, কাউকেই ঠাহর

করতে পারছে না নীচের লোক। পিরামিডের মাথার উপর এসে নিশ্চল হয়ে রইল বিমানখানা, প্রায় তিন চার মিনিট। নামবে হয়ত, ভাবছে নীচের দর্শকেরা। কেউ কেউ এদিক ওদিক তাকাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এখানে বিমানবন্দর নেই। যে-কোন বিমানের পক্ষে এখানে নামার চেষ্টা বিপজ্জনক হতে বাধ্য। বিপজ্জনক—বিমানের নিজের পক্ষে ত বটেই, ধারে-কাছে মাটিতে লোকজন থাকলে, তাদের পক্ষেও।

কিন্তু অচিরেই নীচের লোকেরা বুঝল, এখানে মাটিতে নামার কোন কল্পনাই নেই বিমানচালকদের। পিরামিডের উপরে এর নিশ্চল অবস্থিতি, নিতান্তই সংক্ষিপ্ত সেটা। দর্শকদের চোখের সামনেই ওটা চলতে আরম্ভ করল আবার, ভেসে চলল, জলস্রোতে ছোট্ট নৌকোর মত। অবলীলায়, অতিদ্রুত, পর্দার উপর ছায়াছবির মত মসৃণ ভাবে। মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল, লিবিয়ার মরুর দিকে।

লোকে আর স্ফিংক্স্-এর গাম্ভীর্য নিয়ে গবেষণা করছে না, পিরামিডের সৌষ্ঠব অনুধাবনেরও চেষ্টা করছে না। সবাই এখনো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। কী-জানি যদি চকিতের তরেও আর একবার দেখতে পাওয়া যায় অদৃশ্য সেই বিস্ময়কর বিমান !

নাঃ। আর না। আর আশা নেই তাকে দেখতে পাওয়ার। এইবারে শুরু হ'ল কলরব, প্রশ্নোত্তর, নানা জনের নানা মন্তব্য। এরোপ্লেনের সঙ্গে এই সব লোক শতকরা একশোজনই ঘনিষ্ঠরকম পরিচিত। কিন্তু ঐ যে প্লেনখানা এলো আর গেল, ওটা দস্তুরমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে, বিদ্যুতের মত গতি ওর। আকারটাও নতুন রকমের। হুবহু একটা ঈগল পাখীর মত। তার পরে, বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়, পাখীর মত স্বাভাবিক ভাবে ওর এই ডানা ঝাপটানো। এমনটা কোন প্লেনকে কেউ করতে দেখে নি কোথাও।

থাকুক এরা নিজেদের জল্পনায় মশগুল। যাদের নিয়ে জল্পনা, তারা ততক্ষণে বহু, বহু মাইল পেরিয়ে চলে গিয়েছে লিবিয়ার দিকে। পায়ের তলায় এখন মরুভূমি তাদের। উপরের আকাশ থেকে

সে-বিস্তীর্ণ মরুকে দেখাচ্ছে সমুদ্রতীরের ছোট্ট একখণ্ড বেলাভূমির মত, যার উপরে নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেলায় মেতে ওঠে ধীবর শিশুরা।

গতিবেগ ক্রমে ক’মে এল রূপোলি ঈগল্-এর। আরোহীরা নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃশ্যের পরে দৃশ্য ভেসে আসছে তাদের সমুখে, ফুটে উঠছে ছবির পরে ছবি। বিশেষ নতুন কিছুই না। সেই বালি আর রং, আকাশ আর পৃথিবী। মানুষের জাতটাই মুছে গিয়েছে দৃষ্টির সমুখ থেকে। রয়েছে শুধু দু’টো জিনিস। উপরে আকাশ, নীচে বালি। দু’টোই লাল।

রূপোলি ঈগল-এ মানুষ আজ তিনটি। মর্গানা নিজে, আর তার দুই কর্মচারী। মার্কেস রিভার্ডি আর ইঞ্জিনিয়ার গ্যাসপার্ড। মর্গানার নির্দেশ-অনুযায়ী এই প্লেনখানা গ’ড়ে তুলেছে এই গ্যাসপার্ড লোকটিই। যদিও সেদিন পর্যন্ত তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে রূপোলি ঈগল নামে যে-বস্তুটা গ’ড়ে তুলছে সে, তা একটা অতি-মহার্ঘ খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। পয়সা থাকলে খেয়ালী বড় মানুষেরা বেড়ালের বিয়ে দেয় লাখ-দু’লাখ খরচা ক’রে। মর্গানা রয়াল রূপোলি ঈগল গড়ে তুলবে, তা আর বিচিত্র কী! মর্গানার নিজের প্ল্যান! হুবহু পাখীর মত চেহারা। পাখীর ডানার মত ডানা। সে-ডানা পাখীর ডানার মতই ঝাপ্‌টাবে এই রূপোলি ঈগল।

গাঁজাখুরি ছাড়া আর কী! গ্যাসপার্ড আর তার সহকর্মী মিস্ত্রিরা নির্দেশমত কাজ ঠিকই ক’রে গিয়েছিল, কিন্তু হাসাহাসি করতেও ছাড়ে নি। এ কেমনধারা প্লেন হে? যার ইঞ্জিন নেই, সে কেমনধারা প্লেন? কিসে চালাবে এটাকে? যা একটা প্রাসাদের মতই প্রকাণ্ড, তা আকাশে উড়বে কিসের জোরে?

যন্ত্র অনেক রকম বসেছে রূপোলি ঈগল-এর সমুখে, পিছনে, দেয়ালে দেয়ালে। মামুলি যন্ত্র কোনটাই নয়। সব নতুন রকম, বিটকেল। প্লেনের যন্ত্র বলতে গ্যাসপার্ড বা অন্য লোকে যা বোঝে, তার কোনটাই নেই এই রূপোলি ঈগল নামক খেলনাটাতে।

তবু যদি এটা ওড়ে, আকাশে ত উড়ুক। না-ওড়া পর্যন্ত বিশ্বাস

করবে না গ্যাসপার্ড বা তার সহকর্মীরা। মাইনে পাচ্ছে দরাজ রকম, হুকুমও তামিল করছে তারা অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস ত নিজের অন্তরের কথা! গ্যাসপার্ডের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে, বিশ্বাস না-করার।

কিন্তু গ্যাসপার্ডকে করতে হ'ল বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত। কেমন ক'রে কী হ'ল, তা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে যেদিন রিপোর্ট দিল যে গড়নের দিক দিয়ে রূপোলি ঈগল জিনিসটাতে করবার আর কিছু নেই, সেই দিনই দু'টো ছোট্ট টিন হাতে ক'রে রিভার্ডি গিয়ে উঠল বিমানে। ওর মাথার দিকে একটা, পিছনের দিকে একটা ছোট খুপরি আছে কাঠামোর গায়ে। টিন দু'টো থেকে কী একটা তরল পদার্থ সে ঢেলে দিল সেই দুই খুপরিতে। আর তারপর। একটা সুইচ্ টিপে দিতেই নিঃশব্দে আকাশে উঠে গেল রূপোলি ঈগল। শিক্ষিত বৈমানিক রিভার্ডি, নতুন ধরনের বিমান হলেও, মর্গানার নির্দেশগুলো ত মুখস্থই আছে তার, সে নির্ভুল ভাবে, মসৃণ ভাবে আকাশে এক দীর্ঘ চক্কোর দিয়ে নিয়ে এল রূপোলি ঈগলকে, নিরাপদে তাকে আবার ঢুকিয়ে দিল তার বাসস্থানে। এরোড্রোমের আকারের একটা অতি বৃহৎ বাড়ী। তার ছাদটা এ্যালুমিনিয়ামের চাদর দিয়ে তৈরী। ইচ্ছামত সেটা গুটিয়ে রাখা চলে, আবার প্রয়োজনমত তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় বাড়ীটা। যখন আকাশে ওঠার দরকার হয় রূপোলি ঈগলের, বা আকাশ থেকে নেমে ঘরে ঢোকার দরকার হয়, নীচের কারিগরেরা গুটিয়ে ফেলে সেই ছাদ। নীচে থেকে সোজা আকাশে উঠে যায় বিমান, বা উপর থেকে সোজা নেমে আসে মাটিতে। সবই আশ্চর্য এর।

হ্যাঁ, রিভার্ডি যেদিন একা একা আকাশে চক্কোর দিয়ে নিয়ে এল রূপোলি ঈগলকে, গ্যাসপার্ড এবং তার সহকর্মীদের বিশ্বাস হ'ল সেইদিন। বিশ্বাস হ'ল যে মর্গানা রয়াল ধনীর দুলালী এবং খেয়ালী হলেও বেড়ালের বিয়ে দেওয়ার মত লোক নয়। অতি উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সে অধিকারিণী। সে যদি কাগজে লাইন টেনে

দেয়, সেই নক্সা দেখে না তৈরী করা যায়, এমন জিনিস বাস্তবে বা কল্পনার রাজ্যে নেই।

সোনালি ঈগল-এর সেই প্রথম আকাশযাত্রায় তাতে আরোহী ছিল একা রিভার্ডি। আজকের এই দ্বিতীয় যাত্রায় যাত্রী আর চালক মিলিয়ে এরা তিনজন। মর্গানা আসতে চেয়েছিল নিছক একা, কিন্তু রিভার্ডি তাতে এমন সোরগোল শুরু ক'রে দিল যে মর্গানার মত মানুষকেও মত পরিবর্তন করতে হল অবশেষে। "একা যাবেন, সে কী কথা? কত কী বিপদই ত হতে পারে আকাশপথে! একটা যন্ত্র যদি বিগড়ে যায়—"

"আমি নিজে বিগড়ে না দিলে কোন যন্ত্রের সাধ্য নেই বিগড়ে যাবার"—জোর-গলায় শুনিয়ে দিয়েছিল মর্গানা। রিভার্ডি এ-দম্ভোক্তির কী জবাব দেবে, ভেবে পাচ্ছে না, এমন সময় ফাদার এ্যালোসিয়াস বললেন—"মার্কেস যেতে চাইছেন, যেতে দাও না! অন্য কারও সাহায্য তোমার দরকার হবে না, তা ঠিক। তেমনি এটাও ত ঠিক যে তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাবার সাধ্যও নেই কারও!"

একথার মানে যে কী, তা রিভার্ডিও বুঝল না, বুঝল না বোধ হয় মর্গানাও। বুঝবেই যদি মর্গানা, তাহলে ফাদারের ওকথার উত্তরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে শুধু নীরবে চেয়ে থাকবে কেন তাঁর দিকে?

যা হোক, রিভার্ডি যাবে মর্গানার সঙ্গে, এই রকমই স্থির হ'ল যখন, গ্যাসপার্ড বলল—"আমিও যাব। হাতে ক'রে গ'ড়লাম আমি, চ'ড়ে বেড়াবার অনুমতিও ত আমার পাওয়া উচিত!" মর্গানাও ভেবে দেখল, সঙ্গী যদি নিতেই হয়, একজন না নিয়ে দুইজন নেওয়াই উচিত। তাতে লাভ অন্ততঃ এইটুকু আছে যে নিজেকে বিশেষ রকম অনুগৃহীত জীব ব'লে ধারণা করবার সুযোগ রিভার্ডি পাবে না।

"কোন্ দিকে যাব?"—আকাশে উঠে গোড়াতেই জিজ্ঞাসা করেছিল রিভার্ডি। কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে জবাব দিল মর্গানা—"সবই ত শতবার দেখা। ভূমধ্যসাগর, কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, পিরামিড, স্ফিংক্স্। দেখিনি কেবল একটা জিনিস।

যে-জিনিসের কথা ফাদার এ্যালোসিয়াস বললেন পরশু। সেই মরুভূমির ভিতর পিত্তলপুরী। চল, খুঁজে দেখি। কেউ কেউ দেখেছে যখন, আমরাও হয়ত পেতে পারি দেখতে।"

"বলেন কী? পিত্তলনগরী? আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন সেই উপকথায়?"

"আ-হা-হা! বিশ্বাস করা উচিত কিনা, তা বুঝতে হলে ত আগে একবার খুঁজে আসা দরকার! কিছুই ত বেগ পেতে হচ্ছে না আমাদের! যেমন আরামে ব'সে আছি ভেলভেট কুশানের সোফায়, তেমনিই থাকব আমরা, রূপোলি ঈগল যেমন চলছে, তেমনি চলতে থাকবে। মাঝপথে দেখতে পাই যদি কোন নগরী, পিতলের হোক বা লোহার হোক, বিশ্বাস তখন করব। আর আটলান্টিক পর্যন্ত উড়ে গিয়েও যদি কিছুই না দেখতে পাই মরুভূমিতে, অবিশ্বাস করব তখনই। শেষ পর্যন্ত না যাচ্ছি যতক্ষণ, খোলা-মন আমাদের।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, গরিমাময় দৃশ্য।

তবে গরিমাময় সূর্যাস্ত আরও ঢের ঢের জায়গায় দেখেছে মর্গানা রয়াল। এই সেদিনও দেখে এল সিয়েরা-মেডারে প্লাজার বারান্দা থেকে। ঐ সিয়েরা-মেডার! সেখানেও আর এক বিজ্ঞানী—উঁচুদরের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আর একজন—যোগাসনে ব'সে আছে সিদ্ধির কামনায়। কী সে চায়, তা অবশ্য বলে নি সে। বলবে কেন? কোন সাধকই কি আগে থেকে বলে, কী তার সাধনার লক্ষ্য? এই মর্গানা রয়ালই কি বলেছে কাউকে কিছু? এই যে সে সিদ্ধিলাভ করেছে তার নিজের বিশিষ্ট সাধনায়, এখনও কি সে বিশ্ববাসীকে ডেকে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করতে চাইছে? রোজার সীটন! সেও কিছু ঘোষণা করেনি এখনও। তাইতেই অবশ্য বোঝা যায় না যে সে সিদ্ধিলাভ করেছে কিনা। ক'রে থাকে যদি, তবে কী সে?

সুখাসনে অর্ধশায়িত মর্গানা চিন্তায় তন্ময়। রূপোলি ঈগল যে একটা চলমান বিমান, তা তার এই ভিতরের ঘরে ব'সে কিছুমাত্র বোঝার উপায় নেই। পাশাপাশি দু'খানা ছোট কেবিন, সর্ববিধ

বিলাসের উপকরণে সাজানো। কক্ষপ্রাচীরগুলিতে অবশ্য গায়ে গায়ে অসংখ্য যন্ত্র বসানো রয়েছে। কিন্তু সে-সবই মহার্ঘ ভেলভেট পর্দা দিয়ে আগাপাস্তলা ঢাকা। এ-পর্দা খুলবার মত প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রেই হবে ব'লে মর্গানা আশঙ্কা করে না।

রিভার্ডি-ই এখন চালকের আসনে। সেইখান থকে সে ডেকে বলল—"ম্যাডাম, আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন না ত ?"

"ক্লান্ত ? এইটুকু পথ আসতেই ?"—চোখ মেলে জবাব দিল মর্গানা।

"বলছেন বটে এইটুকু। কিন্তু সিসিলি থেকে হাজার মাইলেরও বেশী আমরা এসে গেছি। গ্যাসপার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রিভার্ডি—"রূপোলি ঈগল তার গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কী বল ?"

ঈগলের লেজ থেকে গ্যাসপার্ড বলল—"ঘণ্টায় আড়াই থেকে তিনশো মাইল। ভিতরে বসে অবশ্য তা টের পাওয়া যায় না।"*

মর্গানা প্রশ্ন করল—রূপোলি ঈগল-এর দৌড় যে শুধু ক্ষিপ্র নয়, নিরাপদও, এটা তোমরা এখন বিশ্বাস করছ ত ?"

"মাদামা, আপনার কথাতেই আমার বিশ্বাস। আপনার জ্ঞান আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশী। এ-বিমানের গোপন রহস্য আমি কিছুই জানি না, বুঝি না। যেটুকু চোখে দেখছি, তাতেই আমি স্তম্ভিত। অর্থাৎ এর শক্তি আর সাফল্য।"

"তাহলে আর কী, এইবার খেয়ে নেওয়া যেতে পারে"—একটা চামড়ার ঝুড়ি থেকে বাসন, গেলাস, খাদ্য, পানীয়, সব টেনে টেনে বার করল মর্গানা—"কাইরোতেও হোটেলে খেয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু তাতে মজা হত না কিছুই। এখানে মহাশূন্যে বিমান থামিয়ে আমরা আহারে বসেছি, নিজেদের আলো যা আছে তা ত আছেই, তার উপরেও বাড়তি আলো পাচ্ছি নানা নক্ষত্র থেকে, এ একটা নতুনতরো অনুভূতি, নয় ?"

* মেরি করেলির যুগে ওরকম গতিবেগ বিস্ময়করই ছিল। এখন অবশ্য শব্দের চেয়েও দ্রুত চলে অনেক বিমান।

একটা সুইচ টেনে দিতেই বিমানের সমস্ত অভ্যন্তরভাগটা—আলোয় আলো হয়ে উঠল—"কোথায় এলাম আমরা? এখনো কি লিবিয়ার মরুভূমিতেই আছি?"

চার্ট দেখে রিভার্ডি বলল—"না। লিবিয়ার সীমা পেরিয়ে আমরা এখন সাহারার উপর দিয়ে যাচ্ছি।"

রিভার্ডি থামিয়ে ফেলেছে রূপোলি ঈগলকে। মর্গানা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তার এই অভিনব বিমানের চারদিকে। তার রং এখন লাল-সবুজ ক্বচিৎ বা অল্প খানিকটা জায়গায় ঘোলাটে লাল, অস্তমিত সূর্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ওটা। নীচে অনন্ত আঁধার, নিবিড়, সূচিভেদ্য সেই অসীম কালোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মর্গানার শিরায় শিরায় শিহরন জাগছে একটা। স্বভাবতঃ অদম্য সাহস তার বুকে, কিন্তু এই মুহূর্তে একটা অস্পষ্ট অজানা আতঙ্ক যেন তাকে বিবশ করে ফেলতে চাইছে। গ্যাসপার্ড আর রিভার্ডি খেতে বসেছে। খেতে খেতেই গ্যাসপার্ড বলল—"এ যাবৎ ত নিরাপদেই এলাম আমরা। এখন নিরাপদে সিসিলিতে ফিরতে পারলে বুঝি।"

নীচুগলাতেই সে কথা বলছে, কিন্তু মর্গানার কানে ঠিক ঢুকে পড়েছে সে কথা। জানালার ধার থেকেই সে জবাব দিল—"কাল পারবে ফিরতে। সত্যিই ত, সারা মরুতে যদি অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই না থাকে—"

"আর কী থাকবে মাদামা? মরুভূমিতে আর কী দেখার আশা করেন?—গ্যাসপার্ড জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

"আশা ত করেছিলাম অনেক কিছুই দেখতে পাওয়ার—ভগ্ন মন্দির, স্তম্ভ, বিরাট বিরাট মূর্তি, নতুন নতুন স্ফিংক্স, কত কী! কিন্তু এখন এই অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখবার উপায় নেই। নাও, এইবার চালিয়ে দাও বিমান আবার।"

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ওদের। রিভার্ডি ফিরে গিয়ে বসল তার চালকের আসনে, গ্যাসপার্ড ঈগলের লেজে নিজের স্থানে। তাদের

দিকে আর তাকাচ্ছে না মর্গানা। বাইরের ঐ নিঃসীম নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে সে তাকিয়ে আছে নিস্পন্দের মত। হঠাৎ—

ঘণ্টা বাজে কোথায়? এই নিরালম্ব অন্তরীক্ষে?

ঘ-ণ্টা? হ্যাঁ, সুস্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি। দূরাগত, সুমধুর সে ধ্বনি, অশেষ প্রশান্তির আশ্বাস সেই ধ্বনিতে।

প্রায় দুই মিনিট কান পেতে সেই ধ্বনি শুনল মর্গানা। সে যে স্বপ্ন দেখছে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নিজেকে সেইটিই বোঝাবার চেষ্টা করল দুই মিনিট ধরে। তারপর সে ডাকল—"মার্কেস! গ্যাসপার্ড! শুনছ?"

কোন উত্তর নেই।

আশ্চর্য ত! লোক দু'টো সাড়া দেয় না কেন? পিছন ফিরে তাকাল মর্গানা বিমানের অভ্যন্তরে। তাকিয়েই সে চ'মকে উঠল। রিভার্ডি, গ্যাসপার্ড নিজের নিজের জায়গায় কেউ নেই। দু'জনেই এসে কক্ষতলে সটান পড়ে আছে। অজ্ঞান? নিদ্রিত? মৃত?

ছুটে গিয়ে দু'জনকেই পরীক্ষা করে দেখল মর্গানা। না, মরে নি কেউ তবে অজ্ঞান হয়েছে, না শুধুই ঘুমিয়ে পড়েছে, তা হঠাৎ বোঝা যাচ্ছে না!

বোঝা যাচ্ছে একটা জিনিস শুধু। বিমান চলতে শুরু করেছিল, কিন্তু আবারও থেমে পড়েছে।

৯

রিভার্ডি, গ্যাসপার্ড মরেনি যখন, ওদের তদ্বির পরে করলেও চলবে। এখনকার প্রথম কর্তব্য হ'ল বিমান কেন চলছে না, সেইটি পরখ ক'রে দেখা।

নিজে গিয়ে স্টিয়ারিং* ধ'রে বসল মর্গানা। তারই উদ্ভাবিত এই সব যন্ত্রপাতি, রিভার্ডি, গ্যাসপার্ডকে এসব চালানোর কায়দা নিজেই সে শিখিয়ে দিয়েছে। কাজেই স্টিয়ারিংয়ে বসতে যাওয়া তার পক্ষে দুঃসাহসের কিছু নয়।

কিন্তু ব'সে কী হবে! চাকা ঘুরছে না, ঘুরছে না কোনমতেই। মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করতে লাগল মর্গানার। তা হলে কি রূপোলি ঈগলের ধ্বংসই হবে? তার আবিষ্কার একদম ভুয়ো প্রমাণ হয়ে গেল? এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হ'ল, তাই যদি হয়, এক্ষুণি বিমান থেকে নীচের মরুতে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত তার। যে-প্রতিভার এত গর্ব সে করেছে এতদিন, তাই যদি শূন্যগর্ভ সাব্যস্ত হয়, জীবনধারণের কী প্রয়োজন তার?

সেই পরিপূর্ণ হতাশার মুহূর্তে মর্গানা দেখল, কোথা থেকে একটা আলোক রশ্মি, নীল লোহিত একটা রশ্মিশলাকা এসে তার হাতের উপর পড়ল। চাকার উপরে তার মুষ্টি পাকানো, সেই মুষ্টির উপর দিয়ে কনুই বেয়ে ক্রমে বাহুমূলে পৌঁছালো সেই শলাকা। তারপর—

বিস্ময়ে ভয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে মর্গানা। সেই শলাকা যেন কথা কয়ে উঠল মর্গানার কানের কাছে—"ভয় করবার কিছু নেই। যন্ত্র তোমার ঠিকই আছে। বিমান আপাততঃ চলছে না, কারণ বায়ুমণ্ডলে একটা বাধার সমুখে পড়েছে বিমান। বাধাটা সচরাচর থাকে না।

* নিয়ন্ত্রক চাকা

এখানে, আমরা সৃষ্টি করেছি বাধাটা। এদিকে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না তোমাদের। ফিরতে হবে।"

ভয়ে বিস্ময়ে রুদ্ধবাক মর্গানা। সেই স্বরই তাকে বলছে—"তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

মর্গানা বিমানের অভ্যন্তরে সর্বত্র তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এলো একবার। আগের মতই কোমল উজ্জ্বল আলোকে তা উদ্ভাসিত। সে-আলোকে এমন কিছুই তার নজরে এলো না, যাকে এই অশরীরী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব'লে সে সন্দেহ করতে পারে। অগত্যা সে প্রশ্ন করল—"কে আপনি কথা কইছেন?"

"নীচের স্বর্ণনগরীর অধিবাসী একজন। শব্দরশ্মির কথা জানা আছে কি তোমার? সেই শব্দ রশ্মিতে কথা কইছি আমি।"

সর্বগ্রাসী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে শুনছে মর্গানা। কণ্ঠস্বর থামে নি তখনো, স্নিগ্ধ মধুর ভাষায় বলে যাচ্ছে,—"বেতার টেলিফোন জিনিসটা তোমাদের বেশ জানা আছে। তারই একটা উন্নততর সংস্করণ আমাদের এই শব্দরশ্মি। আরও কিছুদিন সাধনা করলে তোমরাও পারবে এর আবিষ্কার করতে। এই দেখ না! টেলিফোনে বার্তা-প্রেরক লাগে, বার্তা-গ্রাহকও লাগে। আমাদের দরকার হয় না কোনটাই। যতদূরেই হোক, বার্তা আমরা পাঠাতে পারি। যাকে পাঠাই, সে তা শুনতেও পায়।"

ধীরে ধীরে সাহস ফিরে আসছে মর্গানার। বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে তার অন্তরে যে তার এতদিনের অন্তরের কামনা চরিতার্থ হতে যাচ্ছে আজ। এই কামনা যে অন্য কোন মানুষ যেসব তথ্য জানে নি এতদিন, সে তা জানবে। সেই অশরীরী কণ্ঠস্বরকে সে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি একটা বাধার কথা বলছেন। কী বাধা?"

"আমাদের স্বর্ণনগরীর চারিদিকে রক্ষাব্যূহ আছে একটা, তারই বাধা। রক্ষাব্যূহ বলতে স্রেফ হাওয়া ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু। ঈথারের একটা বিশিষ্ট বলয়। ইচ্ছামত সেটা আমরা সৃষ্টি করতে পারি, ইচ্ছামত করতে পারি অপসারিত। সে-বলয়

যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় যখন, কোটি কোটি বোমাও তাকে চূর্ণ করতে পারে না। যা এসে আঘাত করবে তার গায়ে, তাই হবে বিধ্বস্ত। তোমাদের আসতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মহামরুর এত গভীরে কোনদিন কেউ আসে নি আগে। তোমাদের আমরা ফিরে যাওয়ার সংকেত করেছিলাম ঘণ্টা বাজিয়ে, তাতেও তোমরা নিরস্ত হলে না দেখে শেষ কালে আমরা গতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছি তোমার বিমানের।"

এমন মধুর ঐ অশরীরীর কথাগুলি! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে মর্গানার, যেন কত কালের পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে সে টেলিফোনে কথা কইছে নিজের ঘরে নিরাপদে বসে। সে হেসে বলল—"অনেক দয়া আপনাদের।"

তার হাসির উত্তরে ওধারেও একটা হাসি শোনা গেল না কি?" মর্গানা এবার জিজ্ঞাসা করছে—"আমি কি তাহলে বন্দী?"

"না, না, তা কেন? যেভাবে এসেছ, সেইভাবেই ফিরে যাও, কেউ বাধা দেবে না।"

নেমে গিয়ে আপনাদের স্বর্ণনগরী একবার দেখে আসতে পারি না?"

অশরীরী আবার হাসল বুঝি—"না, সেইটি হয় না।"

"কেন হয় না, জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"হয় না, কারণ তুমি আমাদের কেউ নও।" তারপরই কী-যেন একটু সংকোচ সে কাটিয়ে উঠল চেষ্টা ক'রে—"একাও আসনি তুমি।"

রিভার্ডি আর গ্যাসপার্ডের অচেতন দেহ দু'টোর দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে মর্গানা বলল—"আমার সঙ্গীরা ত মরার মত পড়ে আছে।"

"কিন্তু মরেনি ত পুরোপুরি"—জবাব এল ত্বরিতে।

"ঐ শক্তিই কি ওদের চৈতন্য হরণ করেছে? ঈথার বলয়ে যে-প্রতিরোধ শক্তির কথা আপনি বলছিলেন?"

"ঠিক ধরেছ—"

"কিন্তু আমার চৈতন্য ত রয়ে গেল !—কেন রয়ে গেল ?"

"রয়ে গেল তারই দরুন, যা তোমার ভিতরেই আছে, ওদের ভিতরে নেই। রয়ে গেল তারই দরুন, যা তোমাকে করেছে মর্গানা, ওদের করেনি।"

এই কথা শুনে মর্গানার দেহের প্রতিটা তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শে বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীর মত। এই অশরীরী নাম জানেন তার। সে-নাম উচ্চারণ করেছেন যে সুরে, তা সঙ্গীতের চেয়েও মধুর। মর্গানা সমুখে ঝুঁকে পড়ল, হাত বাড়িয়ে দিল, যেন অশরীরীর করস্পর্শেরই বাসনায়। "আপনি আমাকে জানেন, দেখছি। কী ক'রে জানলেন ?"

"আমরা সবাই জানি তোমাকে। কী ক'রে জানি—অর্থাৎ, তুমিও আমাদেরই একজন। একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের কেউ নও তুমি। সেটা ঠিক বলিনি আমি। আমাদেরই, আমাদেরই তুমি। আসবে তুমি, আসবেও আমাদের মধ্যে। তবে তা আজ নয়। ঐ সঙ্গী দু'টির জন্যও বটে। তাছাড়া, একটা মস্ত কাজ তোমার বাকী আছে এখনও বাইরের জগতে।"

"কা-জ বাকী আছে ? কী কাজ ?"

"বাড়ী ফিরে গিয়েই জানতে পারবে। আপাততঃ, তোমাকে আমাদের মধ্যে নিয়ে যেতে পারছি না বটে, তবে আমরা যে সত্যিই আছি, আমরা যে মরু পর্যটকদের বর্ণিত মরীচিকা মাত্র নই, তার একটা প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। মরীচিকাও নয়, পিত্তলনগরীও নয়। সত্যিই আছে আমাদের একটি মহানগরী, পিতলের নয়, খাঁটি সোনারই তৈরী। আগাগোড়া সোনা দিয়ে একটা বৃহৎ নগরী গ'ড়ে তোলা সম্ভব ব'লে ক্ষুদ্রমতি পর্যটকেরা বিশ্বাস করবে কেমন ক'রে ? তাই তারা সিদ্ধান্ত করেছে, নগরটা আমাদের ঝকমক করে যখন, পিতলই হবে হয়ত ওর উপাদান। তুমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াও, এক্ষুণি চাক্ষুষ দেখতে পাবে আমাদের স্বর্ণনগরী—"

মর্গানা এক দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জানালার কাছে। বাইরে

এক নজর তাকিয়েই সে চীৎকার ক'রে উঠল, যুগপৎ আতঙ্কে আর উল্লাসে। ক্ষণপূর্বের সেই নিবিড় কালো আঁধার অপসারিত হয়েছে মহাশূন্য থেকে, এক উজ্জ্বল আলোর প্লাবনে উদ্ভাসিত আকাশ পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বুকে বহু মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল মহানগরী। স্বর্ণপ্রাসাদে, স্বর্ণস্তম্ভে, সোনায়-মোড়া রাজপথে, সেতুচত্বর, উদ্যান উপবনে সুসজ্জিত, স্থির বিজুরী দীপ্তিতে জাজ্বল্যমান।

"এ ত ভেল্‌কি নয়? মায়া নয়? সত্যি সত্যিই স্বর্ণনগরী?" ব'লে উঠল মর্গানা।

অশরীরী বলল—"মায়া নয়, খাঁটি সত্য, অনেক পর্যটকই দূর থেকে দেখেছে একে। কিন্তু কাছে ত তাদের আসতে দিইনি আমরা, তাই তারা দেশে গিয়ে গল্প বলেছে এক মরু মরীচিকার। পৃথিবীর সুপরিচিত নগরগুলির মধ্যে প্রাচীনতমের চেয়েও প্রাচীন আমাদের এই নগর। স্থায়ীও হবে বেশীদিন, অন্য সব নগরের চেয়ে!"

"আমায় কি কোনদিনই দেবেন না এখানে আসতে?"—আকুল আকাঙ্ক্ষার সুর মর্গানার কথায়—

"অচিরেই দেব। অচিরেই। আগেই ত বলেছি—একটা কাজ তোমার বাকী আছে এখনও নিজের দেশে। সেইটি সমাধা হলেই চ'লে এসো তুমি। তবে এলে আর যেতে পাবে না ফিরে। আমরা যারা আছি এখানে, কেউ ফিরিনি আমরা।"

"যাঁরা আছেন? কতদিন আছেন?"

"তা আছি, যীশুর আবির্ভাবের সময় থেকেই।"

"আপনি ইংরেজীতে কথা কইছেন। অথচ অত আগে ত ইংরেজী ভাষা বর্তমান আকারে পৌঁছোতেই পারে নি!"

"তা ত পারেই নি! কিন্তু তাতে কী? শুধু ইংরেজী নয়, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা, প্রত্যেকটাই আমরা জানি। শুধু ভাষাও নয়, দৈনন্দিন যা-কিছু নতুনের আবিষ্কার বা পুরোনোর বিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীতে, এইখানে ব'সে আমরা তার খবর পাচ্ছি। আমরা যেন তোমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের কোষাগার। তোমাদের যা কিছু মহৎ, তা

সঞ্চিত হচ্ছে এখানে। তার উপরেও এমন সব জিনিস আছে, যা তোমরা এখনও আয়ত্তে আনতে পার নি। যথা এই শব্দরশ্মি, আলোক-রশ্মি।"

"আলোক-রশ্মি! আপনি ত ইচ্ছে করলেই আপনার মূর্তিখানি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন আলোক-রশ্মিতে!"

"তা পারি, তবে তার প্রয়োজন কিছু নেই। বাড়ী ফিরে যাও। তোমরা যাঁকে ফাদার এ্যালোসিয়াস ব'লে জান, আমার আকৃতি ঠিক তাঁরই মত।"

* * *

"মার্কেস! মার্কেস! গ্যাসপার্ড! গ্যাসপার্ড!"

ওরা দু'জনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। মর্গানাকে আসীনা দেখল স্টিয়ারিং হুইলে। বিমান চলেছে বিদ্যুতের বেগে।

"সর্বনাশ! আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? দু'জনেই এক সাথে? কী লজ্জা? আপনাকে নিজে চালাতে হ'ল রূপোলি ঈগল?"

"খাওয়ার পরে ঘুম স্বভাবতঃই আসে। লজ্জা পাওয়ার কী আছে তাতে? বরং একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ভালই করেছ। এখন আবার খাটতে পারবে সারা রাত। ভোর নাগাদ আমরা সিসিলি পৌঁছে যাব, আশা করি।"

"সিসিলি? আমরা কি ফিরে চলেছি? কেন, বলুন ত?"

"হ্যাঁ, ফিরেই চলেছি। কারণ যেদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে আর ওরা যেতে দিলে না। সেই একটা ঘণ্টাধ্বনি শুনেছিলে কি? ঘণ্টা বাজিয়ে ওরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল—"রাস্তা বন্ধ, ফিরে যাও"।

সিসিলিতে ফিরে প্রথমেই মর্গানা দেখা করতে গেল যার সঙ্গে, তিনি ফাদার এ্যালোসিয়াস। ফাদারের মূর্তির মধ্যেই স্বর্ণনগরীর অশরীরীকে সে দেখতে পাবে, আশ্বাস পেয়েছে মর্গানা। শুধু মূর্তি দেখা নয়, স্বর্ণনগরী সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞাতব্যও ত তাহলে ফাদারের কাছে সে পেতে পারে। তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় এখন, এ্যালোসিয়াস স্বর্ণনগরীর সঙ্গে কোনরকম একটা দুর্বোধ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

গল্পচ্ছলে পিত্তলনগরীর উল্লেখ করে তিনিই মর্গানাকে উৎসাহিত ক'রে তুলেছিলেন সেই গল্পের দেশ আবিষ্কারের অভিযানে বেরুবার জন্য।

এ্যালোসিয়াস স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন মর্গানাকে। বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করলেন—"আছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ ওঁদের। কালক্রমে আমিও যাব ওখানে। প্রতীক্ষা করব পৃথিবীর বুকে নবমানবের আবির্ভাবের। পুরোনো এই যে মানুষ জাতিটা, জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি ক'রে থাকলেও ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধ'রে গিয়েছে এর। নৈতিক মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে গিয়েছে। এই মানবজাতিটা বিলুপ্ত হবে। এবং তারপরই স্বর্ণনগরবাসী—নব মানবজাতি এসে ভার নেবে পৃথিবী পালনের। যীশুর পুনরাগমনের মানেই তাই।"

কথা কইছেন এ্যালোসিয়াস, একটা শলাকার মত আলোক-রশ্মি এসে পড়ল তাঁর হাতের উপরে। সেটা ত্বরিতে উঠে গেল তাঁর বাহুমূলে, কানের কাছে।

এ্যালোসিয়াস গভীর মনোযোগে শুনছেন কী যেন বার্তা। মর্গানা তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। এ্যালোসিয়াস কিছুক্ষণ ধ'রে শুনছেনই তন্ময় হয়ে। এ রকম ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত মর্গানা। সে প্রতীক্ষা করে আছে, ফাদার অবশ্যই তাকে বলবেন সব কথা।

ধীরে ধীরে রশ্মিশলাকা মিলিয়ে গেল ফাদারের বাহু থেকে, তিনি বললেন—"রূপোলি ঈগল নিয়ে তোমাকে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। কে এক রোজার সীটন ঘোর বিপন্ন। ঠিক দুই দিন সময় আছে তোমার হাতে। সিয়েরা-মেডার! বহুদূর। এর মধ্যে পারবে তার কাছে পৌঁছোতে?"

"পারতেই হবে," বলল মর্গানা।

১০

ম্যানেলার হয়েছে বিপদ। সীটন আজ সকাল থেকে উন্মাদের মত আচরণ করছে। সেই চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকেই।

প্লাজার ঠিকানাতেই এসেছিল চিঠি। তা-ছাড়া আর ঠিকানা কী আছে সীটনের। প্লাজার ম্যানেজার সেটা দিলেন আইরিশ জেক-এর হাতে। সে তা নিয়ে গদাই-লস্করী চা'লে রওনা হয়ে গেল মরণকুঠির পানে। হাতের কাজ সেরে ম্যানেলাও পিছু নিল তার। চিঠি অবশ্যই সেই ভদ্রলোকের চিঠি, যিনি সেদিন এসে গেলেন একবার।

ম্যানেলা গিয়ে লুকিয়ে পড়ল কুঁড়ের আড়ালে। সীটন সেই ঘরেই আছে। হাতে খোলা চিঠি। এক একবার দাঁড়িয়ে পড়ছে মেজেতে, ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে নিচ্ছে এক একবার চিঠিখানার দিকে, আর হুঙ্কার ক'রে উঠছে মরণাহত শ্বাপদের মত—"কী? নেবে না? দায়িত্ব নেবে না? কুছ পরোয়া নেহি! আমার অস্ত্র, এর দায়িত্ব আমিই নেব। আমিই জানিয়ে দেব তুনিয়ার সব জাতিকে। জানিয়ে দেব যে আর তাদের দেওয়া হবে না যুদ্ধ করতে। যে করতে চাইবে যুদ্ধ, তাকে সমূলে ধ্বংস করব আমি। আমি! এই রোজার সীটন! বিশ্বধ্বংসী মরণাস্ত্রের অধিকারী! পৃথিবীর শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে যে-জাতি, তার অস্তিত্বই আমি মুছে দেব পৃথিবীর বুক থেকে। ভস্ম ক'রে দেব তাদের দেশ! সমুদ্রে ডুবিয়ে দেব তাদের দেশ। শূন্যে লাফিয়ে উঠবে সে-দেশের সব পাহাড়, আর তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে গ্রাম-নগর সব-কিছুকে চাপা দিয়ে। কে রুখবে আমাকে? ফুঃ! জার্মানি? ফুঃ! ইংলণ্ড? ফুঃ! যুক্তরাষ্ট্র? ফুঃ! আমি পৃথিবীর শান্তিরক্ষক! পৃথিবীর অধীশ্বর আমি! যুদ্ধ আমি হতে দেব না আর। যে-যুদ্ধ হয়ে গেল সেবার, সেই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ পৃথিবীর। আমি বলছি,

আর হবে না যুদ্ধ! আমি পৃথিবীর অধীশ্বর!! আমি বলছি আর হবে না যুদ্ধ!"

ব্যাপারখানা এই, সাম গোয়েণ্ট যা আশঙ্কা করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। সেনেটে তিনি উত্থাপন করেছিলেন সীটনের আবিষ্কারের এবং প্রস্তাবের কথা। প্রচণ্ডভাবে আপত্তি উঠেছে সে-প্রস্তাবে। দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী যারা, অগাধ অর্থের এবং অসীম প্রতিপত্তির অধিকারী, তারা এককাট্টা হয়ে বিরোধিতা করেছে তার। যুদ্ধ বন্ধ করা? সর্বনাশ! অস্ত্র তৈরী করে যারা, রসদ সরবরাহের ঠিকাদারি নেয় যারা, তারা পথে বসবে যে তাহ'লে! অনেক কলকৌশল ক'রে অনেকদিনের তোড়জোড়ের ফলে তবে তারা এক একটা যুদ্ধ বাধাতে সক্ষম হয়। সে-যুদ্ধ যখন বাধে, তখনই দু'টো পয়সার মুখ দেখে তারা। সেই যুদ্ধ একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব? এ-প্রস্তাব যে ক'রে, সে উন্মাদ। সে ধনিকতন্ত্রেরই শত্রু। তাকে পাগলাগারদে পাঠানো দরকার। তার আবিষ্কৃত মারণাস্ত্র আটলাণ্টিকে ফেলে দেওয়া উচিত। কদাপি কেউ কান দিও না তার কথায়। যুদ্ধ বন্ধ হলে রুজি-রোজগারই ত বন্ধ ধনীদের।"

গোয়েণ্ট সবিস্তারে সব জানিয়ে দিয়েছেন সীটনকে। যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকৃত। অন্য কোন রাষ্ট্র? ধনিক মনোবৃত্তি সর্বত্রই একরকম। কেউ রাজী হবে না, যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াসে মুখ্য ভূমিকা নিতে। অতএব গোয়েণ্টের পরামর্শ, সীটন তার অস্ত্র সমুদ্রেই ফেলে দিক। সব শ্রমই ব্যর্থ হ'ল সীটনের। কী আর করা যাবে?

কী করা যাবে? সীটন দেখিয়ে দেবে, কী করা যায়। সে নিজেই দেখিয়ে দেবে। শ্রম পণ্ড হতে দেবে না সে। ব্যর্থ হতে দেবে না তার যুগান্তকারী আবিষ্কার। কারও খোসামোদ আর সে করবে না। নিজেই ইস্তাহার পাঠাবে পৃথিবীর সব দেশে॥ নিজের আবিষ্কারের কথা, নিজের সংকল্পের কথা ঘোষণা ক'রে। "যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দেশকে নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার। ধ্বংস আমি করবও, যদি কোন দেশ যুদ্ধের দিকে এক পা অগ্রসর হও।

আমার সংকল্প এই, আমার আদেশ এই। আমিই এখন অধীশ্বর পৃথিবীর। আমার আদেশ, যুদ্ধ আজ থেকে বন্ধ হ'ল পৃথিবীতে।"

জোর-পায়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করছে সীটন, আর নিজের মনে হুঙ্কারের পরে হুঙ্কার ক'রে যাচ্ছে। ম্যানেলা উঁকি দিচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে, কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। সীটনের ভাবভঙ্গী তর্জন-গর্জন দেখে আর শুনে ম্যানেলার ভয় করছে রীতিমত। ইংরেজীও তত ভাল জানে না। "পৃথিবীর অধীশ্বর" মানে কী? কেন ঐ বুলিটাই বারবার কপচাচ্ছে সীটন? পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? মর্গানা রয়াল ব'লেছিল, সীটনের জীবন সংশয় হ'তে পারে যে-কোনদিন। ঠিক সেই কথাই কয়েকদিন আগে মিস্টার গোয়েন্টও ব'লে গিয়েছেন। সেই জীবন-সংশয় বিপদেরই কি সূচনা এইসব?

ম্যানেলা স্থির ক'রে ফেলল, আজ-আর সীটনকে একা ফেলে সে চ'লে যাবে না প্লাজায়। তাতে তার চাকরি থাকুক আর না-থাকুক।

সীটন ও কী বলছে আবার? আপন মনে গজরাচ্ছে ক্রুদ্ধ ভালুকের মত। "আগে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে আসি। যতদিন ব্যবহারের দরকার না হ'চ্ছে, নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখাই উচিত। হাতের নাগালে কোথাও রাখা ঠিক নয়। হঠাৎ হয়ত আমারই হাতের ধাক্কায় বিস্ফোরণ হ'য়ে যেতে পারে। তাহ'লেই ব্যস! সীটনই খতম। পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবীর অধীশ্বরও খতম।"

বলতে বলতে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, অট্টহাস্য ক'রে উঠেছে সীটন। সে-হাসি শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ম্যানেলার। বদ্ধ পাগলের হাসি।

সীটন বেরুলো ঘর থেকে। পিছন পানে তাকালেই দেখতে পেতো, দূরে দূরে তার অনুসরণ ক'রে বরাবর চ'লে আসছে ম্যানেলাও। কিন্তু সীটন একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

সীটন চ'লে গেল পিছনের পাহাড়ে। চূড়ায় উঠল তার। তারপর ও পিঠ দিয়ে নামতে লাগল। পাহাড় পেরোলো ম্যানেলাও। কিছুক্ষণের

জন্য সীটন তার দৃষ্টির বাইরে ছিল। এবার যখন আবার তাকে দেখতে পেলো ম্যানেলা, তখন তার কাঁধে একটা চুপড়ি, তাতে সারি সারি কতকগুলো কালো চোঙ্গ বসানো। এক ফুট আন্দাজ লম্বা। টিন ঐ রকম কোন হাল্‌কা ধাতুর তৈরী ব'লে মনে হয়। কোথায় ছিল এসব? অবশ্যই পাহাড়ের গায়ে কোন গর্তের ভিতর। ছোট ছোট গুহা আর গহ্বর ত অনেকই আছে!

সীটন নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রায় খাড়া পাহাড়। তার কাঁধে ঐ সব চোঙ্গ। কী এসব? ম্যানেলার ভয় করছে ওগুলো দেখে। সীটনের জীবন-সংশয় হ'তে পারে, বলেছে মর্গানা আর গোয়েণ্ট। সে-সংশয়ের মূল কি ঐ চোঙ্গগুলো নাকি?

প্রায় খাড়া পাহাড়। সীটন অবলীলায় নেমে যাচ্ছে। ও নিশ্চয়ই এসব জায়গায় আনাগোনায় অভ্যস্ত। কিন্তু ম্যানেলা ত অভ্যস্ত নয়। দারুণ কষ্ট হচ্ছে তার। কিন্তু উপায় কী? ফিরে যাওয়ার কথা মনেও হচ্ছে না একবারও। সীটনকে সে চোখের আড়াল করবে না আজ। সীটনের যে-বিপদের কথা মর্গানা আর গোয়েণ্ট বলে গিয়েছিল, তা নিশ্চয় আসন্ন। আজই হয়ত হয়ে যাবে একটা কিছু। এ-সময়ে কি ম্যানেলা তাকে ফেলে চ'লে যেতে পারে?

পাহাড়ের নীচে নেমেছে সীটন। সেখানে একটা জলস্রোত বইছে খরবেগে। তার ওধারে আবার পাহাড়। তবে এ-পাহাড় আর খাড়া নয়। স্তরে স্তরে উঠে গিয়েছে, মাঝে মাঝে অপরিসর খোঁদল রচনা ক'রে ক'রে। কোন খোঁদলের উপরটা খোলা, কোনটার মাথায় ছাদের মত আচ্ছাদন। এইরকম একটা ছাদওয়ালা খোঁদলে ঢুকে পড়ল সীটন।

জলস্রোতটা সীটন দিব্যি পায়ে হেঁটে পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জল সব জায়গায় সমান নয়। ম্যানেলা যথাসম্ভব সীটনের পায়ে পায়েই পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হঠাৎ তার কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেল জলে। ম্যানেলার ভয় হ'ল, সে হয়ত ডুবে যাবে এক্ষুণি। তার অজান্তেই একটা চীৎকার বেরিয়ে পড়ল তার মুখ থেকে।

আর সেই চীৎকার শুনে ঝুড়ি কাঁধে গুহা থেকে বেরিয়ে এল সীটন। একটা আওয়াজ সে শুনেছে। মানুষের আওয়াজ ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু মানুষ এখানে আসবে কোথা থেকে? ব্যাপারটা বুঝবার জন্য সে ফিরে এসেছে জলধারাটার দিকে। আর এসেই দেখতে পেয়েছে ম্যানেলাকে। জল থেকে উঠে সে পোষাক নিংড়োচ্ছে তখন।

ম্যানেলাকে দেখেই গর্জে উঠল সীটন—"হতচ্ছাড়ি, এখানেও তুই? আজ তোকে খুনই ক'রে ফেলব।" এই ব'লে সে ছুটে আসছিল ম্যানেলার দিকে। পায়ে একখানা পাথর বেধে হঠাৎ সে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল। আর তার কাঁধ থেকে ঝুড়িটা ছিটকে পড়ল মাটিতে, চোঙ্গগুলো—ওঃ—

একটা শতবজ্রের মিলিত নির্ঘোষ যেন। গোটা সিয়েরা-মেডার পর্বতটাই যেন পৃথিবীর বুক থেকে নিজের শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে সশরীরে লাফিয়ে উঠল আকাশে।

ম্যানেলা সেই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে ফেলল ধরাশায়ী সীটনকে—

* * *

তিন ঘণ্টার মধ্যে রূপোলি ঈগল এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই জায়গাটারই মাথার উপরে।

ভূপ্রকৃতির চেহারা এখানে যেমনটি দেখে গিয়েছিল আগের বার, এবার তা থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখতে পেলো মর্গানা। সিয়েরা-মেডার পর্বতটাই নেই আর। খণ্ড বিচ্ছিন্ন অনুচ্চটিলা আছে অগুন্তি, তাদের পাশ দিয়ে দিয়ে শতশত জলধারা বইছে সশব্দে। সে-জল থেকে ধোঁয়া উঠছে, গন্ধ উঠছে গন্ধকের মত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে-অরণ্য ছিল, তা আর নেই। গাছগুলো উপড়ে উড়ে গিয়ে পড়েছে দূর দূরান্তরে।

প্লাজা নেই। ভগ্ন, চূর্ণ, ইট-পাথরের গাদা এখন। তার তলায় চাপা পড়েছে কত যে মানুষ, তার হিসাব কেউ জানে না। ম্যানেজার

নিখোঁজ, দাসদাসীরা নিখোঁজ, অতিথিরা নিখোঁজ। সবই ঐ ইট-পাথরের গাদার নীচে। এভসবেরিই নিকটতম শহর, কিন্তু সে-শহরও নিদারুণ ঘা খেয়েছে এই ভূমিকম্পে, সেখান থেকে এখনো কোন সাহায্য এসে পৌঁছোয়নি প্লাজায়।

ভূমিকম্প! হ্যাঁ, পৃথিবীর লোক যা খবর পেয়েছে, তা হ'ল এই যে একটা সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে কালিফোর্নিয়ায়, সিয়েরা-নেভাডার পাহাড় শ্রেণীটাই উৎক্ষিপ্ত হয়েছে মহাশূন্যে। জনবিরল দেশ, এই যা রক্ষা, মানুষ খুব বেশী মারা যায় নি।

রূপোলি ঈগল সিসিলি থেকে বেরিয়েছিল এই তথাকথিত ভূমিকম্পের দুইদিন আগে, শব্দরশ্মি থেকে আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পেয়ে। এসে পৌঁছোলো ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে। এ-তিন ঘণ্টা দেরি না-ও হতে পারত। ঠিক ভূমিকম্পের মুহূর্তেই বিমান এসে পড়তে পারত ঘটনাস্থলে। কিন্তু তাতে বিমানেরই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বায়ুমণ্ডল ত তখন অস্থির!

যা হোক, এসেছে রূপোলি ঈগল। হাওয়ায় ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই জায়গাটার মাথার উপরে, যেখানে অগভীর জলের তলায় দু'টি নরদেহ দেখা যায়, একটার উপরে আর একটা। বিস্ফোরণের ফলেই নদীর জল ফেঁপে উঠে এতদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে তো এখানটা শুক্‌নো ছিল।

বিমান নামছে। পাহাড় ছিল এখানে, তা আর নেই। টিলা আছে এধারে ওধারে। তাদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে নামছে বিমান। মর্গানা দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ যে জলের তলায় দেহ দু'টি—

বিমান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলের মাত্র দশ ফুট উপরে। একটা দড়ি ধ'রে জলে নামল রিভার্ডি। আর দু'টো দড়ি তার কোমরে বাঁধা। সেই দু'টো দড়িতে বেঁধে দিল দেহ দু'টি। তারপর নিজে উঠে এল বিমানে। এবারে রিভার্ডিতে, গ্যাসপার্ডে মিলে একে একে দেহ দুটি টেনে তুলল দড়ি ধরে।

মর্গানা সব জানে। একটুখানি পরীক্ষা করে নিয়েই বলল—

"জীবন এখনো যায় নি এদের। ম্যানেলাকে সহজেই চাঙ্গা ক'রে তুলতে পারব। কিন্তু সীটনের কথা কিছুই বলতে পারি না। যাই হোক, নিয়ে ত যাই। তারপর রোম থেকে প্রোফেসর মার্কো-আর্ডিনিকে এনে—"

রিভার্ডি সায় দিল—"হ্যাঁ, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার এখন আর্ডিনিই বটে। কিন্তু দেহ থেকে প্রাণ যদি বেরিয়েই গিয়ে থাকে—"

তিনদিন পরে সিসিলির প্যালাজো-ড্য-ওরোতে (রৌপ্যপ্রাসাদে) ডাক্তার মার্কো আর্ডিনির পদার্পণ হ'ল। ম্যানেলা তখন সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সীটনের দেহে জীবনের কোন লক্ষণই নেই। ম্যানেলা ত মর্গানার প্রাসাদে নিজেকে দেখে প্রথমটাতে বুঝতেই পারে না যে কোথা থেকে কেমন ক'রে সে এখানে এলো। যখন বুঝতে পারল, তখনই সে গিয়ে ঘাঁটি হয়ে বসল সীটনের শয্যার পাশে। মার্কো-আর্ডিনি এসে তাকে সেখানেই দেখতে পেলেন।

"এই সেই রোজার সীটন?"—প্রোফেসর আর্ডিনি তাঁর রোগীর পরিচয় শুনে স্তম্ভিত। "বিজ্ঞান জগতের উদীয়মান সূর্য ব'লে যাঁকে আমরা জানতাম? তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ওঁর গবেষণা যে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল বিজ্ঞানী মহলে পাঁচ ছয় বৎসর আগে!"

"এই সেই রোজার সীটন"—বলল মর্গানা—"দেখুন যদি একে আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন যমের মুখ থেকে।"

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন বহুরকমে, বহুক্ষণ ধ'রে। তারপর মাথা নেড়ে হতাশভাবে বললেন—"যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি অবশ্য। কিন্তু যেভাবে ও তারপর বেঁচে থাকবে, সেভাবে না-বাঁচাই ওর ভাল ব'লে মনে করি আমি। মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত লেগেছে, সে-মস্তিষ্ক এখন অসাড় অবস্থাতেই আছে, অসাড়ই থেকে যাবে সারা জীবন। যে-চিন্তা মস্তিষ্কে ছিল আঘাত পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, সেই চিন্তাই সেঁটে ব'সে থাকবে সেখানে, মাঝে মাঝে তারই স্ফূরণ হতে পারে হয়ত মুখ দিয়েও।"

"অর্থাৎ, কথা বলতে পারবে?"—মর্গানা খুব আশান্বিত হয়ে ওঠে।"

"ঐ এক বিষয়েরই কথা, অন্য কোন বিষয়ে নয়।"—বললেন ডাক্তার।

"আপনি দিন ত বাঁচিয়ে—"

"তারপর? ওর দেহ মজবুত, ও হয়ত বাঁচবে বহু বৎসর। কে ওর যত্ন শুশ্রূষা করবে? দেহের দিক দিয়ে অসুরের মত হলেও মনের দিক দিয়ে ও থাকবে শিশুর মত। ওকে খাইয়ে দিতে হবে, ধুইয়ে দিতে হবে—"

"সে-সব করবার আপনজন ওর আছে"—বলল মর্গানা—"তাছাড়া মাইনে-করা নার্স যতগুলি বলবেন, আমি রেখে দেব ওর জন্যে।"

"তাহলে আমি বাঁচিয়ে তুলছি ওকে—" বললেন ডাক্তার।

এইবার ম্যানেলাকে সব কথা খুলে বলল মর্গানা। সে ত লাফিয়ে উঠল—"ওর শুশ্রূষা? আমি জীবনপাত করব তাতে। তাই ত আমি চেয়েছি প্রথম থেকেই। আমি ওর স্ত্রী, ওর দাসী, ওর ছায়া—"

সেইদিনই রাত্রিবেলা প্রাসাদের সব বাসিন্দা চমকে উঠল একটা গর্জন শুনে—"যুদ্ধ আর হবে না পৃথিবীতে। আমি বলছি একথা। আমি, পৃথিবীর অধীশ্বর আমি—"

রোজার সীটন বেঁচে উঠেছে। বেঁচে থাকবে ঐ এক চিন্তা মস্তিষ্কে নিয়ে। তার আর ম্যানেলার আর্থিক কষ্ট সারা জীবনে যাতে না হয়, মর্গানা তা করবে এইবার।

*　　　*　　　*

একটা উইল ফাদার এ্যালোসিয়াসের হাতে দিল মর্গানা। এই প্যালাজো-ড্য-ওরো হবে সীটন-ম্যানেলার বাসস্থান। তাদের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যাঙ্কে মজুত রাখছে মর্গানা। আর রিভার্ডিকেও সে দিয়ে যাচ্ছে প্রচুর অর্থ, তার বহু পুরুষের বাসস্থান ভগ্ন প্রাসাদটা মেরামত করে নেওয়ার জন্য।

"তুমি যাচ্ছ তাহলে?"—চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন এ্যালোসিয়াস।

"নিশ্চয়। স্বর্ণনগরীর আহ্বান আমি রোজই শুনতে পাচ্ছি।"

"আমার আহ্বান আসতে দেরি আছে বোধ হয়—" বললেন এ্যালোসিয়াস—"আমার কাজ শেষ হয় নি—"

এর দুই দিন পরেই—

সকালে উঠে রোজই একবার এরোড্রোমে যায় রিভাডি। রূপোলি ঈগল ঠিক ভাবে আছে কিনা, তাই দেখবার জন্য। সেদিন গিয়েই সে নিস্পন্দ হয়ে গেল প্রস্তরমূর্তির মত। রূপোলি ঈগল নেই!

এরোড্রোম শূন্য! উধাও হয়ে গিয়েছে রূপোলি ঈগল।

স্পন্দন যখন ফিরে এল দেহে, রিভাডি দৌড়োলো প্যালাজোর দিকে। দূর থেকেই শুনতে পেলো সীটনের গর্জন—"আমি পৃথিবীর অধীশ্বর। আমি বলছি যুদ্ধ আর হবে না।"

সীটন গর্জন করছে করুক, কিন্তু মর্গানা? মর্গানা কই?

নেই মর্গানা। নেই, নেই। একাই সে গিয়েছে এবার। গিয়েছে তার আপনজনদের কাছে, স্বর্ণনগরীতে।

তাকে আর দেখতে পাবে না কেউ। তবে এ্যালোসিয়াস মাঝে মাঝে তার কথা শুনতে পাচ্ছেন শব্দরশ্মিতে। "সে-সৌভাগ্য আমারও কেন মাঝে মাঝে হবে না ফাদার?"—রিভাডি নিত্য কাকুতি করে এ্যালোসিয়াসের কাছে।

সমাপ্ত